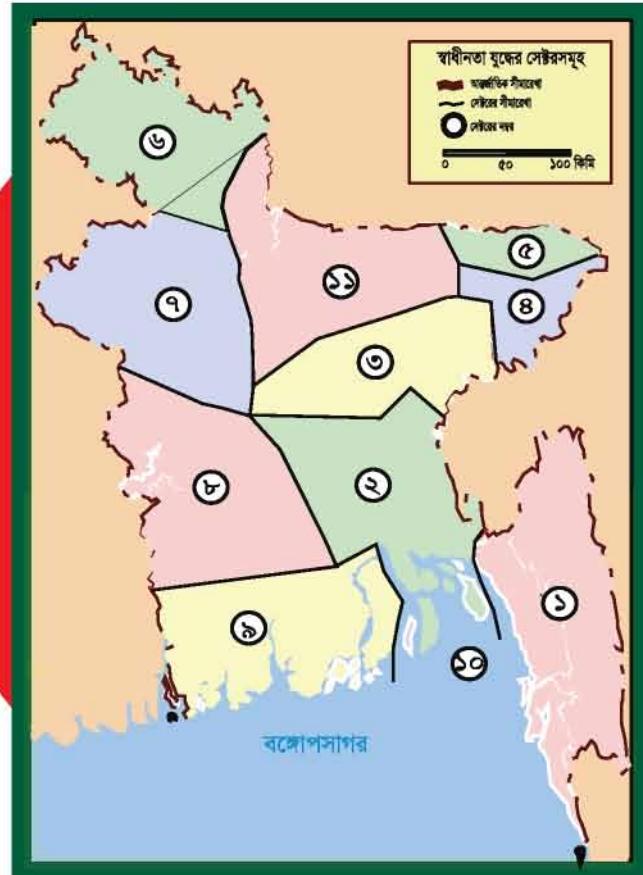


বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর

১ নং সেক্টর- চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী জেলার পূর্বাঞ্চল, ২ নং সেক্টর- নোয়াখালীর অংশবিশেষ, কুমিল্লার অংশবিশেষ, আখাউড়া, ভৈরব এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ, ৩ নং সেক্টর- কুমিল্লার অংশবিশেষ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকার অংশবিশেষ, ৪ নং সেক্টর- সিলেটের পূর্বাঞ্চল, ৫ নং সেক্টর- সিলেটের পশ্চিমাঞ্চল, ৬ নং সেক্টর- রংপুর ও ঠাকুরগাঁও, ৭ নং সেক্টর- রাজশাহী ও দিনাজপুরের অংশবিশেষ, ৮ নং সেক্টর- কুষ্টিয়া, ঘৰোৱা, ফরিদপুর ও খুলনার অংশবিশেষ, ৯ নং সেক্টর- সাতক্ষীরা ও খুলনার অংশবিশেষ, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা, ১০ নং সেক্টর- নৌ সেক্টর অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌ পথ, ১১ নং সেক্টর- ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের রংগকোশল হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর ও ৬৪টি সাব সেক্টরে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সেক্টরের নেতৃত্বে ছিলেন একজন সেক্টর কমান্ডার। কমান্ডারদের সফল নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মুক্ত হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। এভাবে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়। বিভিন্ন সেক্টরের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে- কামালপুর যুদ্ধ, বিলোনিয়ার যুদ্ধ, ভাটিয়াপাড়ার যুদ্ধ, রাধানগর যুদ্ধ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা সপ্তম শ্রেণি

রচনা

ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া

গীতাঞ্জলি বড়ুয়া

ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া

উত্তরা চৌধুরী

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২১

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্প্যাদাবোধ জগত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ক্রপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি শ্রেণি উপযোগী বিষয় ও তথ্যে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টি এবং তাদের দৃষ্টিকে প্রয়োগধর্মী করার লক্ষ্যে এখানে বিষয়বস্তুভিত্তিক চিত্র এবং অনুশীলনমূলক কাজ সন্তুষ্টিপূর্ণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি অধ্যয়নে শিক্ষার্থীরা ধর্ম ও নৈতিকতার আদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হবে। পরিগতিতে তারা গোতম বুদ্ধের অহিংসা, মৈত্রী, করুণা, নৈতিক ও সৎ জীবনের উপায়, বৌদ্ধ ধর্মদর্শন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণকর করে তুলতে পারবে। সর্বোপরি শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় নীতিবোধসম্পন্ন জীবন গড়তে যেমন সমর্থ হবে তেমনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হবে এবং সর্বজনীন কল্যাণবোধ, দেশপ্রেম ও সহনশীলতার চেতনায় অনুপ্রাণিত হবে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের কাছে কেবল ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞানের উৎস না হয়ে বাস্তবজীবনে সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উন্নীত হওয়ার উৎকৃষ্ট সিঁড়ি হবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	গৌতম বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষা	১-১১
দ্বিতীয়	বন্দনা	১২-১৮
তৃতীয়	শীল	১৯-৩০
চতুর্থ	দান	৩১-৩৮
পঞ্চম	সূত্র ও নীতিগাথা	৩৯-৫২
ষষ্ঠ	আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ	৫৩-৫৯
সপ্তম	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব	৬০-৭৪
অষ্টম	চরিতমালা	৭৫-৮৩
নবম	জাতক	৮৪-৯৭
দশম	বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান	৯৮-১০৮
একাদশ	বৌদ্ধধর্মে রাজন্যবর্গের অবদান: সন্তাট অশোক	১০৯-১১৬

প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষা

আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও আগে মহামানব গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। রাজা শুদ্ধেদান এবং রানি মহামায়া ছিলেন তাঁর পিতা-মাতা। মানুষের দুঃখমুক্তির উপায় অস্বেষণের জন্য তিনি রাজপ্রাসাদ, পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন করেন। সুদীর্ঘ ছয় বছর কঠোর সাধনায় তিনি লাভ করেন বৌধিজ্ঞান, খ্যাত হন ‘বুদ্ধ’ নামে। তিনি আবিক্ষার করেন চারি আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং জন্ম-মৃত্যুর কারণ প্রতীত্যসমূৎপাদ তত্ত্ব। সর্ব প্রাণীর কল্যাণের জন্য তিনি প্রচার করেন তাঁর ধর্ম-দর্শন। তাঁর প্রতিটি ধর্মবাণী মানুষকে নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বৃদ্ধ করে। সংযমী, আদর্শবান এবং মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলাই বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এ অধ্যায়ে আমরা গৌতম বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * বুদ্ধ নির্দেশিত নৈতিকতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- * দৈনন্দিন জীবনে বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- * নৈতিক আচরণের সুফল ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

নৈতিকতা ও শীল পালন

‘নীতি’ থেকে ‘নৈতিকতা’ শব্দের উৎপত্তি। ‘নৈতিকতা’ হলো নিয়মনীতি মেনে চলে সুশৃঙ্খল ও সংজীবনযাপন করা। বৌদ্ধধর্মে নৈতিকতার ওপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। গৌতম বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদের সংযত, আদর্শ এবং নৈতিক জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য তিনি অনেকগুলো নিয়মনীতি বা বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছেন। বৌদ্ধ পরিভাষায় এসব নৈতিক বিধি-বিধানকে শীল বলা হয়।

‘শীল’ শব্দের অর্থ হলো স্বত্বাব বা চরিত্র। আবার নিয়ম, শৃঙ্খলা প্রভৃতিও শীল অর্থে ব্যবহৃত হয়। শীল মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ এবং মেশান্দ্রব্য প্রহণ প্রভৃতি হতে বিরত রাখে। কায়, মন এবং বাক্য সংযত করে। মনের কলুষতা দূর করে। নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বৃদ্ধ করে। মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে। তাই বৌদ্ধরা শীল পালনের মাধ্যমে নিজের আচরণ সংযত করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি চৰ্চা করে। যাঁরা শীল পালন করেন তাঁরা শীলবান

নামে অভিহিত হন। শীলবান ব্যক্তি সর্বত্র পূজিত হন। প্রভৃতি যশ-খ্যাতির অধিকারী হন। বুদ্ধ বলেছেন, ‘ফুলের সৌরভ কেবল বাতাসের অনুকূলে প্রবাহিত হয়। কিন্তু শীলবান ব্যক্তির যশ-খ্যাতি বাতাসের অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয় দিকে প্রবাহিত হয়।’ শীলবান ব্যক্তি দয়াশীল, ক্ষমাপরায়ণ, দানপরায়ণ, সেবাপরায়ণ এবং পরোপকারী হন। তাঁদের চিত্ত উদার হয়। তাঁরা সর্বদা কুশলকর্ম সম্পাদন করেন। তাঁরা কখনো মানুষের ক্ষতি সাধন করেন না। তাঁরা মানুষকে নৈতিক জীবনযাপনের উপদেশ দেন এবং উৎসাহিত করেন। শীলবান ব্যক্তি ইহকাল এবং পরকাল উভয়কালেই সুখ লাভ করেন।

পরিশেষে বলা যায়, নৈতিকতা এবং শীল পরম্পরার সম্রক্ষণ। শীল পালন ব্যতীত নৈতিকতার বিকাশ সম্ভব নয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

শীল ও নৈতিকতা বলতে কী বোঝা?

শীলবান ব্যক্তির জীবন কেমন হয় বর্ণনা কর।

শীলবান ব্যক্তির যশ-খ্যাতি এবং ফুলের সৌরভের মধ্যে পার্থক্য কী লেখ।

পাঠ : ২

গৌতম বুদ্ধ ও নৈতিকতা

গৌতম বুদ্ধের জীবন নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিতে ভরপুর। তিনি জন্ম-জন্মান্তরে দশ পারমীর চর্চা করে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধনপূর্বক বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন। তিনি শুধু নিজেই নৈতিক জীবনযাপন করেননি, তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য এবং অনুসারীদেরও নৈতিক জীবনযাপনের শিক্ষা দিয়েছেন। নৈতিকতা ছিল তাঁর ধর্মবাণীর মূল ভিত্তি। নিচে গৌতম বুদ্ধের জীবনে নৈতিকতা প্রদর্শনের দুটি ঘটনা এবং নৈতিক উপদেশ সম্পর্কে জানব।

কাহিনি : ১

গৌতম বুদ্ধ জন্ম-জন্মান্তরে নৈতিক জীবনযাপন করেছেন। কোনো বাধা-বিষয়েই তাঁকে নৈতিকতার আদর্শ হতে চ্যুত করতে পারেনি। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে তিনি বোধিসত্ত্ব অবস্থায়ও নৈতিক জীবনযাপন করে মানবিক কর্ম সম্পাদন করতেন। এখন এবৃপ্ত একটি কাহিনি পাঠ করব।

অতীতে বোধিসত্ত্ব মগধ রাজ্যের মচল গ্রামের এক মহাকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল মথ কুমার। বড় হলে লোকে তাঁকে ‘মথ মানবক’ নামে ডাকত। মচল গ্রামে সে সময় ত্রিশ ঘর লোক বাস করত। মথ মানবক গ্রামবাসীর কল্যাণে সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন। সেই গ্রামের যুবকগণ হত্যা, চুরি, মিথ্যাচার, ব্যভিচার, নেশাদ্রব্য সেবন প্রভৃতি অপকর্মে লিঙ্ঘ ছিল। মথ মানবক তাদের কুশলকর্ম করার জন্য সংগঠিত করেন। এদের নিয়ে তিনি গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতেন। সেতু নির্মাণ করতেন। রাস্তার খাদে আটকে যাওয়া গাড়ির চাকা ওঠাতে সাহায্য করতেন। পুকুরিণী খনন, বৃক্ষরোপণ, জমিচারের জন্য জলাধার ও ধর্মশালা নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কাজ করতেন। দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেন। যুবকগণ বোধিসত্ত্বের উপদেশমতো সকল প্রকার অকুশলকর্ম পরিত্যাগ করে পঞ্চশীল পালন করতে শুরু করেন। ফলে গ্রামে হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাচার, নেশা সেবন ইত্যাদি অপরাধ বন্ধ হয়ে যায়। তখন গ্রামের গ্রামপ্রধান ভাবলেন, ‘আগে যুবকেরা নেশা খেয়ে মারামারি, কাটাকাটি করত। এতে নেশাদ্রব্যের ব্যবসা এবং জরিমানা দ্বারা আমার অনেক আয় রোজগার

হতো। এখন বৌদ্ধিসন্তানের নৈতিক শিক্ষার কারণে আমার আয়-রোজগার ক্ষম হয়ে গেল।' এবং তেবে তিনি ক্ষুধ হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করলেন।



যুবকগণ সাঁকো মেরামত করছে

একদিন গ্রামপ্রধান রাজার কাছে গেলেন। তিনি বৌদ্ধিসন্তান ও যুবকদের বিরক্তে রাজার নিকট নালিশ করলেন, 'মহারাজ! গ্রামে একদল ডাকাত জুটেছে; তারা লুটপাট ও নানা উপদ্রব করে বেড়াচ্ছে।' রাজা গ্রামপ্রধানের কথা শুনে তাদের ধরে আনার নির্দেশ দিলেন। রাজার আদেশে প্রহরীগণ বৌদ্ধিসন্তান ও যুবকদের বন্দি করে আনল। রাজা তাদের কোনো কথা না শুনেই হাতির পায়ের তলায় পিণ্ট করে ঘারার নির্দেশ দিলেন। প্রহরীরা বন্দীদের রাজপ্রাসাদের সামনে রাস্তায় হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে হাতি আনতে গেল। তখন বৌদ্ধিসন্তান সঙ্গীদের বলতে শাগলেন, 'ভাইগণ! শীলগুণ স্মরণ করে মৈত্রী ভাবনা কর। গ্রামপ্রধান, রাজা ও হস্তী কারও প্রতি ক্ষুধ হয়ো না, সকলেই আমাদের প্রিয়জন।' এদিকে তাদের পিণ্ট করার জন্য হাতি আনা হলো। কিন্তু মাতৃত বারবার চেষ্টা করেও হাতিকে বন্দিদের কাছে নিয়ে যেতে পারল না। হাতি বন্দিদের দেখায়াত্ব বিকট শব্দ করতে করতে পালিয়ে গেল। তাদের হত্যা করার জন্য আরও হাতি আনা হলো। সেই হাতিগুলোও একইভাবে পালিয়ে গেল। রাজা ভাবলেন, নিশ্চয়ই বন্দিদের কাছে এমন কোনো ঔষধ আছে যার জন্য হাতিগুলো কাছে যেতে পারছে না। কিন্তু অনুসন্ধান করে তাদের নিকট কোনো ঔষধ পাওয়া গেল না। তখন রাজার মনে হলো তারা যদ্র প্রয়োগ করছে। অতঃপর রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি কোনো মন্ত্র প্রয়োগ করছ? বৌদ্ধিসন্তান বললেন, হ্যাঁ মহারাজ! আমরা মন্ত্র প্রয়োগ করছি বটে। রাজা মন্ত্র জানতে চাইলে বৌদ্ধিসন্তান বললেন, 'আমরা অন্য কোনো মন্ত্র জানি না। তবে আমরা

প্রাণী হত্যা করি না। চুরি করি না। কুপথে ঢলি না। মিথ্যা বলি না। সুরাপান করি না। জনহিতকর কাজ করি। সকলের প্রতি মৈত্রী প্রদর্শন করি। যথাসাধ্য দান করি। পুঁজিরিপি খনন করি। ধর্মশালা নির্মাণ করি। এবৃপ্ত নানা জনহিতকর কাজ করি। অপরের ক্ষতি হয় এবৃপ্ত কাজ করি না। অপরকে কষ্ট দিই না। এই আমাদের মন্ত্র। এই আমাদের শক্তি। মৈত্রী ভাবনা আমাদের মূল মন্ত্র।'

এ কথা শুনে রাজা খুবই প্রসন্ন হলেন। তিনি বৌদ্ধিসন্ত ও যুবকদের নৈতিক ও জনহিতকর কাজের অশংসা করে পুরস্কৃত করলেন।

কাহিনি : ২

বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম বুদ্ধ পঁয়তালিশ বছর সকল প্রাণীর দৃঃখ্যমুক্তির জন্য ধর্ম প্রচার করেন। এসময় তিনি ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি সকল প্রাণীর সেবা ও কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। তাঁর শিষ্য-শিষ্য এবং অনুসারীদের নৈতিক ও মানবিক কর্ম সম্পাদনের উপদেশ দিতেন। এখানে আমরা বুদ্ধের জীবনে নৈতিকতা প্রদর্শনের একটি কাহিনি পাঠ করব।



বুদ্ধ চর্মরোগী ডিক্ষুর সেবা করছেন

একটি ছোট বিহারে কয়েকজন ভিক্ষু থাকতেন। সেই বিহারে তিন্য নামে একজন ভিক্ষু ছিলেন, যাঁর সাথে কারও সঙ্গী ছিল না। সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। একবার তিনি ভীষণ চর্মরোগে আক্রান্ত হন। তাঁর গায়ের ক্ষত থেকে দুর্ঘট্য ছড়াতে লাগল। এরকম যন্ত্রণাকাতের অবস্থায়ও তাঁর সেবায় কেউ এগিয়ে এলো না। হঠাতে বুদ্ধ এ বিহারে আগমন করলে সেবা-শুশ্রাবিহীন মারাত্মক রোগাক্ত এ ভিক্ষুকে দেখেন। বুদ্ধ নিজেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেবায় লেগে যান।

তিনি সেবক আনন্দকে নিয়ে নিজ হাতে রোগীর ক্ষতস্থান পরিষ্কার করেন। তাঁকে স্নান করান। তারপর গা মুছিয়ে পরিষ্কার বিছানায় শুইয়ে দেন। বুদ্ধ বিহারের ভিক্ষুদের ডেকে রোগাক্রান্ত ভিক্ষুকে সেবা না করার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধ তাঁদের কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপার শুনে খুব অসন্তুষ্ট হন। তিনি তাঁদের আচরণকে অনৈতিক ও অমানবিক বলে তিরক্ষার করেন এবং হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করার উপদেশ দেন। অতঃপর তিনি তাঁদের বললেন, ‘দরিদ্রের সহায় হওয়া, অরক্ষিতকে রক্ষা করা, রোগীর সেবা করা, মোহাচ্ছন্নকে মোহমুক্ত করা সকলের নৈতিক কর্তব্য।’ তিনি আরও বললেন, ‘এ জগতে মাতা-পিতা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, আর্তপীড়িত এবং গুরুজনের সেবায় সুখ লাভ করা যায়।’

উপদেশ দানের পর বুদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য নিয়ম প্রবর্তন করলেন: অসুখের সময় শিষ্য গুরুর, গুরু শিষ্যের, সতীর্থ সতীর্থের সেবা করবে।

গৌতম বুদ্ধের নৈতিক উপদেশ

বুদ্ধ ধর্ম-দেশনার সময় অনেক নৈতিক উপদেশ দান করেছেন। এগুলো ত্রিপিটকের প্রথমসমূহে সংকলিত আছে। নিচে বুদ্ধের কিছু নৈতিক উপদেশ তুলে ধরা হলো :

১. মৈত্রী দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে। অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করবে। কৃপণকে দান দ্বারা জয় করবে। আর মিথ্যাবাদীকে সত্য দ্বারা জয় করবে।
২. মা যেমন তার একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করে থাকে, সেরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অগ্রমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে।
৩. রাগের সমান অগ্নি নেই। দ্বেষের সমান গ্রাসকারী নেই। মোহের সমান জাল নেই। ত্রুটার সমান নদী নেই। তাই রাগ-দ্বেষ-মোহ ও ত্রুটা পরিত্যাগ করতে হবে।
৪. দণ্ড এবং মৃত্যুকে সকলেই ভয় করে। জীবন সকলেরই প্রিয়। তাই সকলকে নিজের সাথে তুলনা করে আঘাত কিংবা হত্যা করবে না।
৫. পাপী মিত্র ও অধম ব্যক্তির সংসর্গ না করা উচিত। কল্যাণমিত্র এবং সাধু ব্যক্তির সংসর্গ করবে।
৬. আরোগ্য পরম লাভ, সন্তুষ্টি পরম ধন, বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি, নির্বাণ পরম সুখ।
৭. বহুসত্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা, বহুশিল্প শিক্ষা করা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া, মিথ্যা ও বৃথা বাক্য ত্যাগ করে সুভাষিত বাক্য বলাই উন্নত মঞ্জল।
৮. মাতা-পিতার সেবা করা, স্ত্রী-পুত্রের উপকার সাধন করা এবং নিষ্পাপ ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা উন্নত মঞ্জল।

৯. মূর্খের সেবা না করা, পণ্ডিত ব্যক্তির সেবা করা এবং পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা উভয় মজল।
১০. দুর্দমনীয়, চঞ্চল, যথেচ্ছ বিচরণশীল চিন্তাকে দমন করাই মজলজনক। সংযত চিন্তাই সুখের কারণ।
১১. সঠিকপথে পরিচালিত চিন্তা যতটুকু উপকার করতে পারে মাতা-পিতা বা আত্মীয় স্বজনও তা করতে পারে না।
১২. জ্ঞানী ব্যক্তির জয়, অজ্ঞানী ব্যক্তির পরাজয় ঘটে। ধর্মানুরাগী জয়ী হন কিন্তু ধর্ম হিংসাকারীর পরাজয় ঘটে।
১৩. ক্রোধ সংবরণ কর। অহংকার পরিত্যাগ কর। সকল বৰ্ণন অতিক্রম কর। নাম-বূপে অনাসন্ত ব্যক্তি দৃঢ়খে পতিত হন না।
১৪. নিজেই নিজের আগ কর্তা। অন্য কেউ নয়। নিজেকে সুসংযত করতে পারলে মানুষ নিজের মধ্যেই দুর্লভ আশ্রয় লাভ করতে পারে।
১৫. চন্দন, টগর, পদ্ম অথবা চামেলি ফুলের সুগম্ভও চরিত্রবান ব্যক্তির সৌরভকে অতিক্রম করতে পারে না।
১৬. অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খেরা দৃঢ়খন্দায়ক পাপ কাজের দ্বারা নিজেকে নিজের শত্রুতে পরিণত করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

ওপরে বর্ণিত নৈতিক উপদেশ ছাড়া আরও পাঁচটি নৈতিক উপদেশ লেখ।

তোমার এলাকায় একটি জনহিতকর কাজ কীভাবে করা যায় পরিকল্পনা কর।

হিংসা নয়, আর্তপীড়িতের সেবাই মজল - ব্যাখ্যা কর।

পাঠ : ৩

দৈনন্দিন জীবনে নৈতিকতা অনুশীলন

মানুষ প্রতিদিন নানা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। জগতে ভালো কাজ যেমন আছে, তেমনি মন্দ কাজও আছে। ভালো কাজ মজলজনক এবং প্রশংসনীয়। ভালো কাজ শান্তি প্রতিষ্ঠা করে, অপরের মজল সাধন করে। অপরদিকে মন্দ কাজ ক্ষতিকর এবং নিন্দনীয়। মন্দ কাজ অশান্তি সৃষ্টি করে, অপরকে কষ্ট দেয়। তাই ভালো কাজগুলো নৈতিক এবং মন্দ কাজগুলো অনৈতিক কাজ হিসেবে অভিহিত। সত্যভাষণ, পরোপকার, সেবা, দান, মেত্রীভাব পোষণ, সৎ বাণিজ্য প্রভৃতি নৈতিক কাজ। যারা নৈতিক কাজ করেন তাঁদের নীতিবান বলা হয়। অপরদিকে হত্যা, অদন্ত বন্ধু গ্রহণ, ব্যভিচার, মাদকদ্রব্য সেবন, মিথ্যা ও কর্কশ বাক্য ভাষণ, প্রতারণা, ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ দ্রব্য বাণিজ্য প্রভৃতি অনৈতিক কাজ। যারা অনৈতিক কাজ করে তাঁদের নীতিহীন বলা হয়।

দেশের আইনে এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানে মন্দ কাজ পরিত্যাগ এবং ভালো কাজ সম্পাদন করার নির্দেশনা আছে। দেশের আইনে মন্দ কাজের জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। যেমন : চুরি একটি মন্দ কাজ ও সামাজিক অপরাধ। দেশের আইনে চুরি করলে কারণ্ড ও অর্থ দণ্ড ভোগ করতে হয়। ধর্মগ্রন্থ মতে, মন্দ কাজ করলে মানুষকে নরক যত্নণা ভোগ করতে হয়। মন্দ কাজ ও মন্দ ব্যক্তিকে সবাই ঘৃণা করে। মন্দ ব্যক্তি সর্বত্র নিন্দিত হয়। কিন্তু মানুষ লোভ-দ্রেষ্ম-মোহ বশত এবং নিজের লাভ ও সুবিধার জন্য মন্দ কাজ করে। মন্দ ব্যক্তি সমাজে নানারকম বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। মন্দ ব্যক্তি বিবেকহীন। বিবেকহীন ও নীতিহীন মানুষ পশুর সমান। নৈতিকতা হচ্ছে ভালো ও মন্দ কাজের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের মানদণ্ড। নৈতিকতার অভাবের কারণেই মানুষ মন্দ কাজ করে। মন্দ কাজ পরিত্যাজ্য। তথাগত বুদ্ধ নৈতিকতা অনুশীলনে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তিনি সকল প্রকার পাপকর্ম হতে বিরত থেকে কুশলকর্ম সম্পাদন এবং নিজ চিত্ত বিশুদ্ধ করার উপদেশ দিয়েছেন।

নীতিবান মানুষ মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে ভালো কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। সমাজে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে দৈনন্দিন জীবনে নৈতিকতা অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমরা নৈতিকতা চর্চা করতে পারি। যেমন : মাতা-পিতা, শিক্ষক এবং গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাঁদের আদেশ-উপদেশ মেনে চলা, অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা, সত্যভাবণ করা, নিজের কাজ নিজে করা, পরদ্রব্য না বলে বা না দিলে গ্রহণ না করা, পর দ্রব্যের প্রতি লোভ না করা, মাদকদ্রব্য সেবন না করা, সহপাঠীদের সঙ্গে সদাচরণ করা, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা, অভাবগ্রস্তকে দান করা, আর্তগীড়িতের সেবা করা, পরোপকার করা, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করা ও সংজ্ঞাব বজায় রাখা, অপরকে কষ্ট না দেওয়া, অপরের ক্ষতি হয় এমন কাজ নিজে না করা এবং অপরকে না করতে উৎসাহ প্রদান করা প্রত্তির মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে নৈতিকতা অনুশীলন করা যায়। শ্রেণিকক্ষেও নৈতিকতা অনুশীলন করা যায়। যেমন : শিক্ষকের উপদেশমতো মনোযোগ সহকারে লেখা পড়া করা; সহপাঠীর বই, খাতা, কলম, পেন্সিল প্রভৃতি না বলে না নেওয়া; সহপাঠীকে আঘাত ও কষ্ট না দেওয়া; মিথ্যা দোষারোপ না করা, গরিব বৃক্ষকে শিক্ষা উপকরণ ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করা; নিজে খারাপ কাজ না করা এবং অপরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করা ইত্যাদি। ধর্মীয় অনুশাসন পালনের মাধ্যমে এসব নৈতিক গুণাবলি অর্জন করা যায়। পঞ্চশীল, অষ্টশীল, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রভৃতি অনুশীলনের মাধ্যমে নীতিবোধ জাগ্রত হয়। বুদ্ধের সময় বৃজি বা বজ্জি বৎশীয় লোকেরা অত্যন্ত নীতিপরায়ণ ছিলেন। বুদ্ধ বজ্জিদের কতকগুলো নৈতিক উপদেশ প্রদান করেছিলেন। সেই উপদেশগুলোকে সগু অপরিহানীয় ধর্ম বলা হয়। উপদেশগুলো প্রদানকালে বুদ্ধ বলেছিলেন, ‘যতদিন বজ্জিগণ এ সকল নৈতিক উপদেশ অনুসরণ করে জীবন্যাপন ও রাজ্য পরিচালনা করবে ততদিন তাঁদের পরাজয় হবে না। উত্তরোত্তর তাঁদের সুখ, শাস্তি ও সম্মদ্বি বৃদ্ধি পাবে’ কথিত আছে যে, ‘যতদিন পর্যন্ত বজ্জিগণ বুদ্ধের সেই উপদেশ পালন করেছিলেন ততদিন পর্যন্ত তাঁদের কেউ পরাজিত করতে পারেনি’। এ থেকে বোঝা যায় দৈনন্দিন জীবনে নৈতিকতা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

শ্রেণিকক্ষে তুমি কীভাবে নৈতিকতা অনুশীলন করতে পার লেখ।

পাঠ : ৪

নৈতিকতা অনুশীলনের সুফল

নৈতিকতা অনুশীলনের মাধ্যমে অনেক সুফল অর্জন করা যায়। নৈতিকতা অনুশীলনে মানবিক গুণাবলি বিকশিত হয়। নীতিবান ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ, দায়িত্বশীল, পরোপকারী, সেবাপরায়ণ, সহনশীল, নির্লোভ, সংয়ীমী, ক্ষমাপরায়ণ, মৈত্রীপরায়ণ, সত্যবাদী এবং আত্মবিশ্বাসী হন। এসব নৈতিক গুণের অভাবেই সমাজে অন্যায় অশান্তি বিরাজ করে। সকল পেশার লোক নীতিবান হলে সমাজ থেকে অন্যায় ও অশান্তি দূর হবে। সমাজে সুখ, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে। নীতিবান ব্যক্তি ব্যভিচার, অধিকারহীন অর্থ বিত্ত, নেশন্দ্রব্য, সঙ্গী, মূর্খ সঙ্গী ইত্যাদি বর্জন করেন। তিনি সর্বদা কুশলকর্ম সম্পাদন করেন। পরের মজাল সাধনে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। তাঁর দ্বারা পরিবার, সমাজ ও দেশ উপকৃত হয়। তাই সকলে নীতিবান ব্যক্তিকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে। সকলে তাঁর প্রশংসা করে। তিনি সর্বত্র পূজিত হন। তাঁর যশ-খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

নীতিবানকে বৌদ্ধ পরিভাষায় শীলবান বলা হয়। বুদ্ধ শীলবান ব্যক্তির অনেক প্রশংসা করেছেন। নৈতিকতা বা শীলগালনের সুফল অনেক। যেমন :

১. শীল পালনের ফলে শীলবান ব্যক্তি প্রভূত ধন সম্পদ অর্জন করেন;
 ২. তাঁর সুকীর্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে;
 ৩. তিনি নিঃসংজ্ঞাচে ও নির্ভয়ে সর্বত্র উপস্থিত হতে পারেন;
 ৪. মৃত্যুকালে তাঁর চিত্ত ভ্রম না হয়ে সজ্ঞানে মৃত্যু হয় এবং
 ৫. তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গ ও নির্বাণ লাভ করেন।
- তাই নৈতিকতার সুফল বিবেচনা করে সকলের তা অনুশীলন করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

নৈতিকতা অনুশীলনকারী ব্যক্তির মানবিক গুণাবলি বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. শীল মানবিক গুণাবলি সম্পন্নগঠনে সহায়তা করে।
২. শীলবান ব্যক্তি সর্বত্র পূজিত হন। প্রভূতঅধিকারী হন।
৩. গৌতম বুদ্ধ জন্ম-জন্মান্তরেজীবন যাপন করেছেন।
৪. মূর্খের সেবা না করা, ব্যক্তির সেবা করা এবংব্যক্তির পূজা করা উন্নত মজাল।
৫. নৈতিকতা অনুশীলনে গুণাবলি বিকশিত হয়।

২. মিলকরণ

বাম	ডান
১. শীল শব্দের অর্থ	মূলমত্ত
২. শীলবান ব্যক্তি সর্বত্র	জয় করবে
৩. মৈত্রী ভাবনা আমাদের	উচ্চম মঙ্গল
৪. পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা	চরিত্র
৫. মৈত্রী দ্বারা ক্রোধকে	পূজিত হন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শীল শব্দের অর্থ কী লেখ।
২. শীলবান ব্যক্তি কীরূপ হন?
৩. কয়েকটি নৈতিক কাজের উদাহরণ দাও।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. নৈতিকতা এবং শীল পরম্পরার সম্পর্কযুক্ত আলোচনা কর।
২. বুদ্ধের চর্মরোগী সেবার কাহিনি বিধৃত কর।
৩. নৈতিকতা বিষয়ে গৌতম বুদ্ধের দশটি উপদেশ লেখ।
৪. নৈতিকতা অনুশীলনের সুফল সম্পর্কে তুমি যা জান লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গৌতম বুদ্ধ কত বছর ধর্ম প্রচার করেন?

ক. ২৫	খ. ৩৫
গ. ৪৫	ঘ. ৫৫

২. নৈতিক কাজের উদাহরণ কোনটি ?

ক. সত্য ভাষণ ও মৈত্রীভাব পোষণ	খ. অদ্বুত বন্ধু গ্রহণ করা
গ. কর্কশ বাক্য ভাষণ	ঘ. মুর্দ্দের সেবা করা

৩. বুদ্ধের মতে, “শীলবান ব্যক্তির যশ-খ্যাতি বাতাসের অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় দিকে প্রবাহিত হয়”- এ উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে -

- i. ধর্মের গুণ
- ii. শীল পালনের সুফল
- iii. কুশলকর্মের সুফল

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সৌরভ মারমা উপযুক্ত বয়সে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে বুঝালেন, ধর্মচর্চা শুধু নিজের সুখের সন্ধান এনে দেয় না বরং এটি সর্বজীবের প্রতি দয়াশীল হতে সাহায্য করে।

৪. সৌরভ মারমাৰ ধৰ্মীয় শিক্ষাটি গৌতমবুদ্ধের কোন গুণের প্রতিফলন ?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. জীবপ্রেম | খ. সংকীর্ণতা |
| গ. নৈতিকতা | ঘ. কল্যাণ |

৫. উক্ত গুণের দ্বারা সৌরভ কীভাবে সর্বজীবের সুখ কামনা করবে ?

- i. মৈত্রীর মাধ্যমে
- ii. চরিত্রের উৎকর্মের মাধ্যমে
- iii. অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক ?

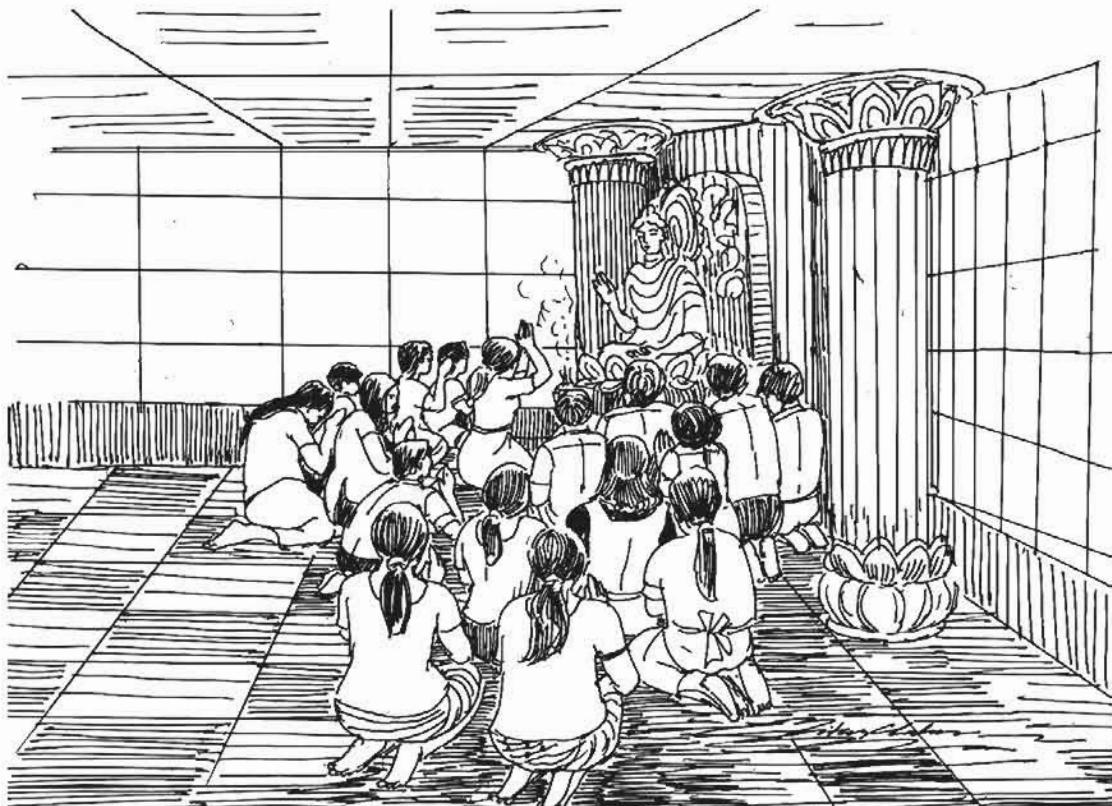
- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

- ১। বোধিনিকেতন বিহারটি এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। বিহারে যাওয়ার পথটি চলাচলের অযোগ্য ছিল। সেখানে কিছু সংখ্যক সন্নাসী থাকায় পৃণ্যার্থীরা লুটপাটের শিকার হতো। তাদের আধিপত্য এতো প্রবল ছিল যে রাস্তাটি সংক্ষার করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। এক পর্যায়ে উক্ত বিহারের সভাপতি সুশীল চাকমা সাহস ও দৃঢ় মনোবল দ্বারা গ্রামের যুবকদের নিয়ে রাস্তাটি মেরামত করলেন।
- ক. গৌতমবুদ্ধের পিতার নাম কী ?
 খ. শীল ও নৈতিকতার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
 গ. সুশীল চাকমার ঘটনাটি বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের কোন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে ?
 ঘ. বর্ণনা কর।
- ঘ. গ্রামবাসীর উন্নয়নে সুশীল চাকমার গৃহীত পদক্ষেপটি বৌদ্ধধর্মের নৈতিকতার দ্রষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।
- ২। সুমন বড়ো ছোটবেলা থেকে ধর্মকর্ম ও জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত থাকতেন। তিনি প্রায়ই বিহারের ভিক্ষু শ্রমণ, পিতা-মাতা ও পরিবার-পরিজনের সেবা করতেন। কিন্তু তিনি একসময়ে দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। সংক্রামক রোগের কারণে পরিবার-পরিজন তাঁকে ফেলে অন্যত্র চলে যায়। এমতাবস্থায় তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয় পবন বড়ো পর্যাপ্ত সেবাযন্নের মাধ্যমে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন।
- ক. মহামানব গৌতমবুদ্ধ কখন জন্মাইছেন ?
 খ. গৌতম কীভাবে বুদ্ধ নামে খ্যাত হলেন ? ব্যাখ্যা কর।
 গ. পবন বড়োর সেবা ধর্মে কোন মহামানবের উপদেশ প্রতিফলিত হয়েছে ? বর্ণনা কর।
 ঘ. পবন বড়োর কর্মটি মানব সেবার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ-পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବନ୍ଦନା

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମେ ବନ୍ଦନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅପରିସୀମ । ବନ୍ଦନାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରା, ଗୁଣୀର ଗୁଣାଳିର ସ୍ମୃତି ବା ଅଶ୍ରୁସା କରା । ତିରତ୍ମ ବନ୍ଦନାର ବୁଦ୍ଧରତ୍ନ, ଧର୍ମରତ୍ନ ଏବଂ ସଂଦରତ୍ନ - ଏହି ତିନଟି ରତ୍ନେର ସ୍ମୃତି କରା ହୁଯ । ତିରତ୍ମର ଗୁଣାଳି ନିବେଦନ କରା ହୁଯ । ତିରତ୍ମ ବନ୍ଦନାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଥା ଆଛେ । କଥନୋ ଛୋଟ ଗାଥାଯ ଆବାର କଥନୋ ବଡ଼ ଗାଥାଯ ତିରତ୍ମ ବନ୍ଦନା କରା ହୁଯ । ଏ ଅଧ୍ୟାୟେ ଛୋଟ ଗାଥାଯ ଯେ ତିରତ୍ମ ବନ୍ଦନା କରା ହୁଯ ତା ପାଠ କରବ ।



ବନ୍ଦନାରତ ବାଲକ-ବାଲିକା

ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷେ ଆମରା -

- * ତିରତ୍ମ ସମ୍ପର୍କେ ବ୍ୟାଧ୍ୟା କରାତେ ପାରବ ।
- * ତିରତ୍ମ ବନ୍ଦନା ପାଲି ଭାଷାର ଆବୃତ୍ତି କରାତେ ପାରବ ।
- * ତିରତ୍ମ ବନ୍ଦନାର ବାଂଲା ବଳାତେ ପାରବ ।

পাঠ : ১

ত্রিভুজ বন্দনা ও তাৎপর্য

বৌদ্ধদের প্রাত্যহিক ধর্মীয় কর্মের মধ্যে ত্রিভুজ বন্দনা অন্যতম। বৌদ্ধদের প্রতিটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ত্রিভুজ বন্দনা করা হয়। আমরা এখন ত্রিভুজ কী সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করব। বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘকে অমূল্যরত্ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নিচে ত্রিভুজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

বুদ্ধরত্ন : ত্রিভুজের মধ্যে প্রথম রত্ন হচ্ছে বুদ্ধরত্ন। ‘বুদ্ধ’ শব্দের অর্থ মহাজ্ঞানী। বুদ্ধ জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই বুদ্ধকে মহাজ্ঞানী বলা হয়। তিনি জন্ম-জন্মান্তরে দশ পারমী পূর্ণ করেছিলেন। শেষ জীবনে ছয় বছর কঠোর সাধনা করে বুদ্ধ হয়েছেন। শ্রেষ্ঠ বুদ্ধরত্নকে আমরা পবিত্র মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করি। তাঁর মহাগুণের প্রশংসা করি। তাঁর মহাজ্ঞানের প্রশংসা করি। যে বন্দনার মাধ্যমে মহামানব বুদ্ধের মহাজ্ঞানের অনন্ত গুণরাশির স্মরণ ও স্তুতি করা হয় এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় তাকে বুদ্ধ বন্দনা বলে।

ধর্মরত্ন : ত্রিভুজের মধ্যে দ্বিতীয় রত্ন হচ্ছে ‘ধর্ম’। ‘ধর্ম’ শব্দের অর্থ ধারণ করা বোঝায়। এখানে ‘ধর্ম’ বলতে সদাচার, নেতৃত্বকা এবং সততাকে বোঝায়। অর্থাৎ যা ধারণ করলে জীবন সুন্দর হয় তাই ধর্ম। বুদ্ধ প্রচারিত বাণী বা মতবাদকে বৌদ্ধধর্ম বলা হয়। যে বন্দনার মাধ্যমে বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও স্তুতি করা হয় তাকে ধর্ম বন্দনা বলে।

সংঘরত্ন : ত্রিভুজের মধ্যে ‘সংঘ’ হচ্ছে তৃতীয় রত্ন। ‘সংঘ’ শব্দের সাধারণ অর্থ বহুজনের সমষ্টি বা সমাবেশ। এখানে ‘সংঘ’ বলতে বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত মহান ভিক্ষুসংঘকে বোঝানো হয়েছে। ভিক্ষুসংঘ বুদ্ধের নিয়ম-শৃঙ্খলা, আদেশ মেনে লোভ-দ্রেষ-মোহবিহীন, সৎ, নেতৃত্ব ও পবিত্র জীবনযাপন করে। তাঁরা বুদ্ধ শাসনে নিজেদের উৎসর্গ করেন। বৌদ্ধধর্মে ভিক্ষুরা শ্রদ্ধা ও দানের উত্তম পাত্র। যে বন্দনার মাধ্যমে বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু সংঘের স্তুতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় তাকে সংঘ বন্দনা বলে।

অনুশীলনমূলক কাজ

ত্রিভুজ কী?

ত্রিভুজ বন্দনা কেন করা হয়?

পাঠ : ২

ত্রিভুজ বন্দনার নিয়মাবলি

ত্রিভুজ বন্দনা করার পূর্বে অবশ্যই আমাদের বেশকিছু নিয়ম পালন করতে হয়। নিয়মগুলো হলো : বন্দনা বিহারে এবং গৃহে বুদ্ধমূর্তির সামনে করা হয়। সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলা বন্দনা করা হয়। বন্দনার পূর্বে হাত-মুখ ভালো করে ধূয়ে নিতে হয়। বন্দনায় পরিক্ষার-পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য। পবিত্র মনে বুদ্ধমূর্তির

সামনে হাঁটু ভেঙে বসে প্রথমে ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করতে হয়। তারপর ত্রিরত্ন বন্দনা করতে হয়। তারপর অন্যান্য বন্দনা করা হয়। বন্দনা শেষ হলে ভিক্ষু এবং অন্য বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করতে হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ
ত্রিরত্ন বন্দনার পূর্বে কী কী করণীয় আলোচনা কর।

পাঠ : ৩

ত্রিরত্ন বন্দনা (পালি)

বুদ্ধং বন্দামি
 ধর্মং বন্দামি
 সংঘং বন্দামি
 অহং বন্দামি সর্বদা।
 দুতিয়মি বুদ্ধং বন্দামি
 দুতিয়মিঃ ধর্মং বন্দামি
 দুতিয়মিঃ সংঘং বন্দামি
 অহং বন্দামি সর্বদা।
 ততিয়মিঃ বুদ্ধং বন্দামি
 ততিয়মিঃ ধর্মং বন্দামি
 ততিয়মিঃ সংঘং বন্দামি
 অহং বন্দামি সর্বদা।

ত্রিরত্ন বন্দনা (বাংলা অনুবাদ) :

আমি বুদ্ধকে বন্দনা করছি
 আমি ধর্মকে বন্দনা করছি
 আমি সংঘকে বন্দনা করছি
 আমি সর্বদা বন্দনা করছি।
 দ্বিতীয়বার আমি বুদ্ধকে বন্দনা করছি

দ্বিতীয়বার আমি ধর্মকে বন্দনা করছি
 দ্বিতীয়বার আমি সংঘকে বন্দনা করছি
 সর্বদা আমি বন্দনা করছি।
 তৃতীয়বার আমি বুদ্ধকে বন্দনা করছি
 তৃতীয়বার আমি ধর্মকে বন্দনা করছি
 তৃতীয়বার আমি সংঘকে বন্দনা করছি
 আমি সর্বদা বন্দনা করছি।

বুদ্ধ বন্দনা

যো সন্নিসিঙ্গো বরবোধিমূলে
 মারং সসেনং মহত্তিং বিজেত্তা,
 সম্বোধিমাগঢিঃ অনন্ত এগাগো
 লোকুন্তমো তৎ পণমামি বুদ্ধং।

বাংলা অনুবাদ : যিনি অনন্ত জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ সম্যক সমুদ্ধ বোধিমূলে বসে সৈন্যসহ মারকে পরাজিত করে সম্বোধি লাভ করেছেন আমি সেই বুদ্ধকে প্রণাম জানাচ্ছি।

ধর্ম বন্দনা

অট্ঠজ্ঞিকো অরিয়পথো জনানং
 মোক্খপ্লবেসায়জুকো'ব মগ্গো,
 ধম্মো অয়ং সন্তিকরো পণীতো
 নীয্যা ণকো তৎ পণমামি ধম্মং।

বাংলা অনুবাদ : যে ধর্ম আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ (পথ) বিশিষ্ট, সকল লোকের মুক্তির জগতে প্রবেশের সোজা পথ, শান্তিকর, প্রণীত বা শ্রেষ্ঠ এবং যেই ধর্ম নির্বাণে নিয়ে যায়, সে ধর্মকে প্রণাম জানাচ্ছি।

সংঘ বন্দনা

সংঘো বিসুদ্ধো বর দক্ষিণেয়ো
 সন্তিন্দ্রিযো সবক্ষমলঞ্চাহীনো,
 গুণেহি নেকেহি সমিদ্বিপত্তো
 অনাসবো তৎ পণমামি সংঘং।

বাংলা অনুবাদ : যে সংঘ বিশুদ্ধ, উত্তম দানের পাত্র, শান্তিন্দ্রিয়, সকল প্রকার পাপমল বিনাশকারী, অনেক গুণে গুণান্বিত সেই অনাসব সংঘকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি।

অনুশীলনমূলক কাজ
ত্রিভুবন বন্দনাটি আবৃত্তি কর।

শব্দার্থ : ত্রিভুবন - তিনটি রত্ন (বুদ্ধরত্ন, ধর্মরত্ন এবং সংঘরত্ন), ধৰ্ম - ধৰ্ম, সংঘ - সমষ্টি, বিশেষ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বোঝায়, অহং - আমি, সববদ্বা - সব সময়, যো - যিনি, মারং - মার, লোকুন্তমো - শ্রেষ্ঠ, বিজেত্তা - জয় করে, সম্মোধিমাগাহিণি - সম্মোধি লাভ করেছেন, অট্টজিঙ্গিকো - আটটি মার্গ, উজ্জু - সহজ ও সরল, বিসুদ্ধো - বিশুদ্ধ, মঞ্জ - মার্গ, সন্তিন্দ্রিয়ো - শান্তিন্দ্রিয়, সন্তিকরো - শান্তিকর, গুণেহি - গুণের অধিকারী, নেকেহি - অনেক, অনাসবো - অনাসব বা অনাসন্ত।

অনুশীলনী

শূল্যস্থান পূরণ

১. বৌদ্ধদের প্রাত্যহিক ধর্মীয় কর্মের মধ্যে বন্দনা অন্যতম।
২. বন্দনার পূর্বে ভালো করে ধূয়ে নিতে হয়।
৩. সংঘো বর দুক্খিনেয়ে।
৪. যা ধারণ করলে সুন্দর হয় তাই ধর্ম।
৫. তাঁরা বুদ্ধ নিজেদের উৎসর্গ করেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বন্দনা বলতে কী বোঝা?
২. বুদ্ধরত্ন কী সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ?
৩. সংঘরত্ন কী সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ত্রিভুবন বন্দনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
২. তুমি কীভাবে ত্রিভুবন বন্দনা করবে-বল।
৩. বুদ্ধ ও সংঘ বন্দনার বাংলা অনুবাদ লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন বন্দনার মাধ্যমে ত্রিভুবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা যায় ?

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ক. বুদ্ধ বন্দনা | খ. ধর্ম বন্দনা |
| গ. সংঘ বন্দনা | ঘ. ত্রিভুব বন্দনা |

২. বুদ্ধকে মহাজ্ঞানী বলার অন্যতম কারণ কোনটি ?

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| ক. দশ পারমী পূর্ণ করায় | খ. মারকে পরাজিত করায় |
| গ. জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় | ঘ. পবিত্র জীবন যাপন করায় |

নিচের অনুচ্ছেদ পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও -

বিভাস চাকমা সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। বিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে প্রতিদিন দুপুরে বিহারের সামনে দাঁড়িয়ে সে বন্দনা করত। বন্দনা করার সময় সে হাতমুখ ধৌত কিংবা স্নান করা-এসব নিয়মনীতি অনুসরণ করত না। বিভাসের এ বন্দনা লক্ষ্য করে একদিন বিহারের ভিক্ষু তাকে বন্দনার নিয়মনীতি অনুসরণ করে বন্দনা করার পরামর্শ দেন।

৩. বিভাস চাকমার পালিত কর্মে কোন বন্দনার ইঙ্গিত করা হয়েছে ?

- | | |
|---------------|---------------------|
| ক. বুদ্ধবন্দন | খ. ধর্মবন্দন |
| গ. ত্রিভুব | ঘ. পিতৃ-মাতৃ বন্দনা |

৪. উক্ত বন্দনার ফলে -

- i. পবিত্র জীবনযাপন করা যায়
- ii. দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়
- iii. নির্বাণ সুখ লাভ করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

- ১। শ্রাবণী বড়ুয়া তাঁর মাতার কাছ থেকে প্রার্থনার নিয়ম-কানুন শিখে তা অনুসরণ করেন। তিনি গৃহে ও বিহারে গিয়ে প্রার্থনা করেন এবং মহাজানীর গুণরাশি স্মরণ ও শুন্ধা করেন। তা ছাড়া তিনি অন্ধাদানের উভয় পাত্রে সঠিকভাবে পূজা ও অর্চনা করেন।
 - ক. ‘বন্দনা’ শব্দের অর্থ কী ?
 - খ. কীভাবে বন্দনা করতে হয় ?
 - গ. শ্রাবণী বড়ুয়া কোন রত্নের গুণটি অনুসরণ করেন ? ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. শ্রাবণীর অনুসরণীয় নীতির দ্বারা ইহ ও পরজীবনে কী ফল লাভ করতে পারবে বলে মনে কর তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ২। পিষ্পু বড়ুয়া বিহারাধ্যক্ষের নিকট পঞ্চশীল গ্রহণ করেন, শীল গ্রহণ শেষে বাঢ়িতে সম্ম্যার সময়-যো সন্নিসিঙ্গো বরবোধিমূলে
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্তা,
সম্বোধিমাগঞ্জিঃ অনন্ত এগাণে
লোকুন্তমো তৎ পণ্মামি বুদ্ধৎ।
ইত্যাদি নিজের ভাষায় রচন করলেন। পরবর্তীতে অন্য রত্নগুলোর তারতম্য মর্ম উপলব্ধি করে প্রতিদিন শুন্ধাভরে প্রার্থনা করতেন।
 - ক. ত্রিরত্ন কী ?
 - খ. বন্দনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর
 - গ. উদ্দীপকে পিষ্পু বড়ুয়ার সান্ধ্যকালীন প্রার্থনায় যে গুণটি প্রকাশ পায় তা বর্ণনা কর।
 - ঘ. পিষ্পু বড়ুয়ার ধর্মচর্চা ব্যক্তি জীবনে কী প্রভাব ফেলবে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

শীল

‘শীল’ নৈতিক জীবন গঠনের দিক নির্দেশনা। শীল পালন বৌদ্ধদের অপরিহার্য নিত্যকর্ম। গৃহে কিংবা বিহারে যে কোনো আচার-অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শীল গ্রহণ করা হয়। কারণ, শীল সকল কুশলকর্মের উৎস। বৌদ্ধরা বিভিন্ন রকম শীল পালন করেন। যেমন : গৃহীরা পঞ্চশীল ও অষ্টশীল, শ্রমণরা দশশীল এবং তিঙ্কুগণ ২২ টি শীল পালন করেন। এ অধ্যায়ে আমরা অষ্টশীল সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- * অষ্টশীল বর্ণনা করতে পারব।
- * অষ্টশীল পালনের প্রয়োজনীয়তা ও নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- * অষ্টশীল গ্রহণকারীর করণীয় বর্ণনা করতে পারব।
- * বাংলা অর্থসহ অষ্টশীল বলতে পারব।
- * অষ্টশীল অনুশীলনের মাধ্যমে অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকার উপায়সমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
- * অষ্টশীল প্রার্থনার প্রক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারব।

পাঠ : ১

অষ্টশীল পরিচিতি

পূর্বে আমরা পঞ্চশীল সম্পর্কে জেনেছি। আজ অষ্টশীল সম্পর্কে জানব। অষ্টশীল পঞ্চশীলের উচ্চতর স্তর। প্রতিদিন পঞ্চশীল পালন করা যায়। অষ্টশীলও প্রতিদিন পালন করা যায়। তবে, গৃহী বৌদ্ধরা সাধারণত পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং অষ্টমী তিথিতে অষ্টশীল পালন করে। বুদ্ধ ধর্ময় উন্নত জীবন গঠনের জন্য অষ্টশীলের প্রবর্তন করেছেন। অষ্টশীল পালনকারীকে উপবাসব্রত পালন করতে হয়। তাই অষ্টশীলকে উপোসথ শীলও বলা হয়। অষ্টশীল গ্রহণকারীকে উপোসথিক বলে। ‘উপোসথ’ শব্দটি উপবাস বা উপবাসক শব্দ হতে গৃহীত। কিন্তু বৌদ্ধমতে, উপোসথ অর্থ কেবল উপবাস করা নয়। উপোসথ গ্রহণকারীকে ধ্যান-সমাধি চর্চা করতে হয়। ধর্মালোচনা শ্রবণ করতে হয়। ধর্মীয় বিষয় অধ্যয়ন করতে হয়। কুশল ভাবনায় নিমগ্ন থাকতে হয়। লোভ-দ্বেষ-মোহ ও তৃষ্ণা মুক্ত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়। ‘অষ্ট’ শব্দের অর্থ আট। আটটি শীল পালন করতে হয় বলে একে অষ্টশীল বলা হয়।

পাঠ : ২

অষ্টশীল গ্রহণের পূর্বে করণীয়

অষ্টশীল গ্রহণের পূর্বে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হয়। ভোরে স্বুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করে পরিষ্কার পোশাক পরিধান করতে হয়। পূজা ও দান সামগ্রী নিয়ে বিহারে যেতে হয়। বুদ্ধবেদিতে শ্রদ্ধাচিত্তে পূজা ও দান সামগ্রী সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখে ভিক্ষুর সামনে বসতে হয়।

অষ্টশীল গ্রহণের নিয়মাবলি

বিহারে ভিক্ষুকে বন্দনা করে ভিক্ষুর নিকট ত্রিশরণসহ অষ্টশীল প্রার্থনা করতে হয়। ভিক্ষু অষ্টশীল প্রার্থনা অনুমোদন করে ত্রিশরণসহ অষ্টশীল প্রদান করেন। ভিক্ষুর নির্দেশনা মতো অষ্টশীল গ্রহণ করতে হয়। নিজ বাড়িতেও অষ্টশীল গ্রহণ করা যায়। সে ক্ষেত্রে বুদ্ধাসনের সামনে বসে নিজে নিজে অষ্টশীল প্রার্থনাসহ অষ্টশীল গ্রহণ করতে হয়। অষ্টশীল প্রার্থনাটি নিম্নরূপ।

অনুশীলনমূলক কাজ
উপোসথ পালনকারীকে কী কী করতে হয়?

পাঠ : ৩

অষ্টশীল প্রার্থনা (পাণি)

ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ অট্ঠজ্ঞসমন্বাগতৎ উপোসথসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্রহং কত্তা সীলং দেথ মে ভন্তে। দুতিয়স্মি ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ অট্ঠজ্ঞসমন্বাগতৎ উপোসথসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্রহং কত্তা সীলং দেথ মে ভন্তে।

ততিয়স্মি ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ অট্ঠজ্ঞসমন্বাগতৎ উপোসথসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্রহং কত্তা সীলং দেথ মে ভন্তে।

বাংলা অনুবাদ : ভন্তে, অবকাশ পূর্বক সম্মতি প্রদান করুন, আমি ত্রিশরণসহ অষ্টাঙ্গ সংযুক্ত উপোসথ শীল-ধর্ম প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

বিভাতীয়বার ভন্তে, অবকাশ পূর্বক সম্মতি প্রদান করুন, আমি ত্রিশরণসহ অষ্টাঙ্গ সংযুক্ত উপোসথ শীল-ধর্ম প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

ত্বতীয়বার ভন্তে, অবকাশ পূর্বক সম্মতি প্রদান করুন, আমি ত্রিশরণসহ অষ্টাঙ্গ সংযুক্ত উপোসথ শীল-ধর্ম প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

ভিক্ষু : যমহং বদামি তৎ বদেথ (আমি যা বলছি তা বলুন)

শীল গ্রহণকারী : আম ভন্তে (হঁয়া প্রভু বলছি)

ভিক্ষু : নমোতস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্মুদ্ধস্স (আমি অর্হৎ সম্যক সম্মুদ্ধকে বন্দনা করছি)।

শীল গ্রহণকারী : নমোতস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্মুদ্ধস্স (তিনবার বলবেন)।

তারপর ভিক্ষু ত্রিশরণ প্রদান করে বলবেন : সরণাগমনৎ সম্পূর্ণং (শরণ গ্রহণ সম্পূর্ণ হলো)।

শীল গ্রহণকারী : আম ভন্তে (হ্যাঁ ভন্তে)

তারপর ভিক্ষু অষ্টশীল প্রদান করবেন। শীল গ্রহণকারী তা মুখে মুখে বলবেন।

অষ্টশীল প্রার্থনা শেষ হলে উপস্থিতি ভিক্ষু বলবেন, তিসরণেন সদ্বিং অট্ঠজ্ঞা সমন্বাগতৎ উপোসথসীলং ধম্মং সাধুকৎ সুরক্ষিতৎ কঢ়া অঞ্চলাদেন সম্পাদেথ (ত্রিশরণসহ অট্ঠজ্ঞা সমন্বিত উপোসথ শীলধর্ম উভমরূপে সংযতে পালন কর)।

অষ্টশীল গ্রহণকারী বলবেন, আম ভন্তে (হ্যাঁ ভন্তে)

এরপর ভিক্ষু অষ্টশীল পালনকারী কিংবা উপোসথধারীদের মঙ্গল কামনা করে সূত্র পাঠ করবেন। সূত্র পাঠ শেষ হলে তাঁরা তিনবার সাধুবাদ দিবেন। তারপর অষ্টশীল গ্রহণকারী ভিক্ষুকে বন্দনা করে আহার করতে যাবেন। দুপুর বারোটার মধ্যে আহার সম্পন্ন করতে হবে। তারপর পানীয় ছাড়া কিছুই গ্রহণ করা যাবে না। অষ্টশীলের প্রতিটি শীল সংযতে পালন করতে হবে।

অনুশীলনমূলক কাজ
অষ্টশীল প্রার্থনাটি সমন্বয়ে আবৃত্তি কর।

পাঠ : ৪

অষ্টশীল

(পালি ও বাংলা)

অষ্টশীল : পালি

পাণতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিযামি।

অদিল্লাদানা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিযামি।

অব্রহ্মচারিয়া বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিযামি।

মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিযামি।

সুরা-মেরেয-মজ্জ পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিযামি।

বিকালভোজনা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিযামি।

নচ-গীত-বাদিত-বিসুকদস্সন-মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণমণ্ডন-বিভূসনট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিযামি।

উচ্চস্থনা-মহাস্থনা বেরমণী সিক্খাপদৎ সমাদিযামি।

অষ্টশীল : বাংলা

আমি প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি অদন্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি অক্রাচর্য থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
 আমি মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
 আমি সুরা জাতীয় বা কোনো মেশাদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
 আমি বিকাল ভোজন থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
 আমি নাচ-গান-বাদ্য উৎসব দর্শন, সুগন্ধিযুক্ত প্রসাধন দ্রব্য ধারণ মণ্ডন বিভূষণ থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
 আমি উচ্চ শয্যা বা মহাশয্যা থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।



ভিক্ষু হতে অনুশীলন গ্রহণ করছে

অনুশীলনমূলক কাজ
অনুশীলন পালিতে বল (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৫

উপোসথ পালনকারীর কর্মীয়

সৎসারে অবস্থান করে সব সময় অনুশীলন পালন করা সম্ভব নয়। উপোসথ দিবসে অনুশীলন গ্রহণকারীদের ঘথাসন্তুষ্ট বিহারে অবস্থান করে ধর্মশ্রবণ, ধর্মালোচনা, সূত্রপাঠ, ধ্যান-সাধনা, অধ্যয়ন প্রভৃতি করা উচিত। তবে একটা বিষয় বলা দরকার যে, সব সময় ভিক্ষু উপস্থিত নাও থাকতে পারেন। সেক্ষেত্রে অনুশীলন

গ্রহণকারীগণ নিজেরা ধর্মালোচনা, সূত্রপাঠ, অধ্যয়ন এবং ধ্যান-সাধনায় মগ্ন থাকতে পারেন। শীলভঙ্গ হয় এমন স্থানে না যাওয়া উচিত।

নিচে অষ্টশীল পালনকারীদের কিছু করণীয় বিষয় তুলে ধরা হলো।

১. কারও অনিষ্ট কামনা করা কিংবা অনিষ্ট করা বা করানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
২. কোনো প্রাণীকে পীড়া দেওয়া এবং পীড়াদানের কারণ হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
৩. কোনো প্রকার অন্যায় করা কিংবা অন্যায়ের কারণ হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
৪. লোভ-দ্বেষ-মোহ মুক্ত থাকতে হবে।
৫. মান-অভিমান ও ঈর্ষা থেকে মুক্ত থাকতে হবে।
৬. সর্ব প্রকার মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকতে হবে।
৭. প্রমাদমূলক বিনোদন থেকে বিরত থাকতে হবে।
৮. ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
৯. একাগ্রচিত্তে ধর্মদেশনা শুনতে হবে।
১০. কায়মনোবাক্যে সংযত আচরণ করতে হবে।
১১. সকলের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হতে হবে।
১২. ভাবনা অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনমূলক কাজ

অষ্টশীল গ্রহণকারীর করণীয় ও অকরণীয় বিষয়গুলো একটি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

পাঠ : ৬

অনৈতিক কাজের ক্ষতিকর দিকসমূহ

অষ্টশীলের নির্দেশিত বিধি-বিধান মেনে চললে আদর্শ এবং নৈতিক জীবনযাপন করা যায়। অষ্টশীল পালন না করলে মানুষ অনৈতিক কাজের দিকে ধাবিত হয়। এই অনৈতিক কাজের কারণে মানুষ সীমাহীন দুঃখ ও নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। অনৈতিক কাজের কিছু ক্ষতিকর দিক নিচে তুলে ধরা হলো :

- ক. প্রাণহত্যা একটি অনৈতিক কাজ। বৌদ্ধমতে প্রাণহত্যা করা অনুচিত। হত্যা প্রবণতা মনের মৈত্রীভাব নষ্ট করে। মানুষকে ক্রুৰ্ব ও প্রতিশোধপরায়ণ করে তোলে। ফলে নানা রকম সামাজিক অপরাধ সংঘটিত হয়।
- খ. অদন্ত বস্তু গ্রহণ বা নিজের অধিকারে নেওয়া একটি অনৈতিক কাজ এবং সামাজিক অপরাধ। এর জন্য দণ্ডভোগ করতে হয়। পরকালেও শাস্তি পেতে হয়।
- গ. অনৈতিক কামাচার একটি সামাজিক অপরাধ। ব্রহ্মচর্য পালনকারীকে সকল প্রকার কামাচার থেকে বিরত থাকতে হয়। অনৈতিক কামাচারে শারীরিক ও মানসিক জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। এ কারণে মৃত্যুও হতে পারে।
- ঘ. মিথ্যাকথা বলা নেতৃত্বকার পরিপন্থি। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। মিথ্যাবাদী সমাজে মর্যাদা পায় না। সর্বত্র নিন্দিত হয়।

- ঙ. নেশাদ্রব্য গ্রহণ ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ। নেশা স্বাস্থ্য নষ্ট ও মানসিক বিকারগ্রস্ত করে। নেশায় আসক্তির ফলে ধন-সম্পদ নষ্ট হয়। চরিত্র ও মানবিক মূল্যবোধের অধঃগতন হয়। নেশা সেবনকারীরা নানারকম অপরাধে লিঙ্গ হয়। এরা নানারকম ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।
- চ. দুপুর বারোটার পর খাবার গ্রহণ করাকে বিকাল ভোজন বলা হয়। খাবারের প্রতি আসক্তি ও অপরিমিত আহার দান, শীল, ধ্যান-সমাধি ইত্যাদি ধর্মচর্চা ব্যাহত করে। ফলে নির্বাণের পথে পরিচালিত হওয়া যায় না।
- ছ. নাচ, গান, বাদ্য-বাজনা, সুগন্ধি-প্রসাধন লেপন ইত্যাদিতে অনুরুক্তভাব মনের একাথতা নষ্ট করে। ধর্মচর্চা ব্যাহত হয়। ফলে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব হয় না।
- জ. বিলাসবহুল শয়্যায় শয়ন ও উপবেশন মানুষকে আরামদ্রিয় ও অলস করে তোলে। মানসিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা নষ্ট হয় বলে অলস ব্যক্তি কখনোই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে না।

পাঠ : ৭

অষ্টশীল পালনের সুফল

অষ্টশীল পালনের সুফল অনেক। অষ্টশীল পালনের সুফলসমূহ নিম্নরূপ :

অষ্টশীল পালনের ফলে

- ক. আচার-আচরণ সংযত হয়।
- খ. যশ-খ্যাতি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।
- গ. ধন-সম্পদ সুরক্ষিত থাকে।
- ঘ. সৎ কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।
- ঙ. অভাবগ্রস্ত হয় না।
- চ. প্রিয়ভাজন হওয়া যায়।
- ছ. সংযম ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়।
- জ. মন থেকে হিংসা বিদ্বেষভাব দূর হয়।
- ঘ. নীরোগ ও দীর্ঘজীব হয়।
- ঙ. অশেষ পুণ্য অর্জিত হয়।
- ট. নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

এখন আমরা উপোসথ পালনের সুফল সম্পর্কে একটি কাহিনি পড়ব। উপোসথ শীল পালনের সুফল বর্ণনা করতে গিয়ে বুদ্ধ তাঁর পূর্বজীবনের এ ঘটনাটি বলেন।

বোধিসত্ত্ব একবার বারানসিতে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন রাজগৃহ নগরীতে এক সৎ ধনী ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হলেও খুব দয়াবান ছিলেন। পরের দুঃখ-কষ্ট তাঁকে খুবই ব্যথিত করত।

তিনি পরের দুঃখ-কষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন। তা ছাড়া তাঁর পরিবারের সবাই শীল পালন করতেন। উপোসথ দিবসে উপোসথ পালন করতেন। এজন্য তাঁর পরিবার সকলের নিকট ‘শুচি পরিবার’ নামে পরিচিত ছিল।

বোধিসত্ত্ব তখন পরের কাজ করে জীবনধারণ করতেন। একদিন তিনি কাজের সম্মানে বের হয়ে সেই ধনী লোকটির বাড়িতে উপস্থিত হন। গৃহকর্তাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে বললেন, আমি কাজের আশায় আপনার কাছে এসেছি। তখন গৃহকর্তা বললেন, আমার ঘরের দাস-দাসীসহ সকলেই শীল পালন করে। উপোসথ শীল রক্ষা করে। তুমিও যদি শীল রক্ষা করো তবে কাজ পাবে।

বোধিসত্ত্বের অন্তরে সুষ্ঠ ছিল জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফল। তাঁর অন্তরে ছিল শীলের প্রভাব। তিনি কি এ ধরনের শর্ত গ্রহণ না করে পারেন? শীল পালনের নাম শুনে তিনি মনে আনন্দ লাভ করলেন। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, প্রভু! আমি তাই করব।

তারপর বোধিসত্ত্ব ঐ ধনী লোকের বাড়িতে অত্যন্ত সততার সাথে কাজ করতে থাকেন। তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল প্রভুর মঞ্জল সাধন করা।

প্রতিদিনের মতো একদিন তিনি সকালে উঠে কাজে চলে যান। সেদিন ছিল উপোসথ দিবস। কিন্তু বোধিসত্ত্ব তা ভুলে গিয়েছিলেন। এদিকে গৃহকর্তা দাস-দাসীসহ সকলকে নিয়ে উপোসথ শীল গ্রহণ করেন। বিকালে তাঁরা নীরব স্থানে বসে শীলানুশৃঙ্খলা ভাবনা করছিলেন। সন্ধিয়ার বোধিসত্ত্ব কাজ করে বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন কোথাও কেউ নেই। সমস্ত বাড়ি নিস্তর্ক। এদিকে সারাদিন কাজ করতে গিয়ে তিনি কোনো আহার গ্রহণ করতে পারেননি। পেটে ক্ষুধা। একজন দাসী তাঁকে দেখতে পেয়ে খাবার নিয়ে এলো। খেতে বসে বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন অন্যদিন কত লোক থাকে। আজ আমি ছাড়া আর কেউ নেই। এর কারণ জানতে চাইলে দাসীটি বলল, আজ উপোসথ দিবস। সকলে উপোসথ পালন করছেন। দাসীর মুখে এ ধরনের কথা শুনে তাঁর পেটের ক্ষুধা উধাও হয়ে গেল। তখন তিনি ভাবলেন, আজ আমিও উপোসথত্বে পালন করব। এই বলে তিনি আহার না করে উঠে গেলেন।

তারপর গৃহকর্তার নিকট গিয়ে বোধিসত্ত্ব বললেন, ‘প্রভু! আমার ভুল হয়ে গেছে। আজ উপোসথ তা আমি জানতাম না। তাই সকালে উপোসথ গ্রহণ করতে পারিনি। আমি এখন অষ্টশীলসহ উপোসথশীল গ্রহণ করতে চাই। প্রভু, আমি তা পারব কি?’ তখন গৃহকর্তা বললেন, অর্ধেক দিন পালন করলে ফলও অর্ধেক হবে। এ কথা শুনে বোধিসত্ত্ব অষ্টশীল গ্রহণ করে শীলানুশৃঙ্খলা ভাবনা করতে থাকেন। সারাদিন পরিশ্রম করেছেন। তাই বেশিক্ষণ তিনি ভাবনা করতে পারেননি। ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তবু উপোসথ শীল পালনের সংকল্প করলেন।

রাত গভীর হলো। হঠাতে করে তিনি পেটে বেদনা অনুভব করলেন। ক্রমে তাঁর বেদনা বাঢ়তে থাকে। সীমাহীন যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতে থাকেন। তা গৃহকর্তার কানে গেল। তিনি তাঁকে খাবার খেতে বললেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব কোনো খাবার গ্রহণ করলেন না। তিনি গৃহকর্তাকে বললেন, মৃত্যু হলেও আমি আহার গ্রহণ করব না।



ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁ ଆହାର ପ୍ରାପଣ ନା କରେ ଚଳେ ଯାଇଛନ

ଭୋର ବେଳା ବାରାନ୍ଦିରାଜ ପ୍ରାତ-ଅମପେ ବେର ହଲେନ । ଅମପେର ଏକପର୍ଯ୍ୟାମେ ସେଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାଡ଼ିର ସାମନେ ଏସେ ଉପସଥିତ ହନ । ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁ ରାଜାକେ ଦେଖେ ଚିନତେ ପାରଲେନ । ଏ ସମୟ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର । ଏ ସମୟ ରାଜାକେ ଦେଖିତେ ପେଯେ ତୀର ଅନ୍ତର ଆନନ୍ଦେ ଭରେ ଗେଲ । ତଥନ ତିନି ଭାବଲେନ, ଆମି ଯଦି ପରଜନ୍ୟେ ରାଜା ହତେ ପାରତାମ ! ଏ ଧରନେର ଚିନ୍ତା କରତେ କରତେ ତିନି ମାରା ଗେଲେନ । ଶୀଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ସେବ୍ଗ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରେନ, ମୃତ୍ୟୁର ପର ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ । ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟଫଳେ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁ ବାରାନ୍ଦି ରାଜାର ପୁତ୍ର ହେଁ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପଣ କରେନ । ତଥନ ତୀର ନାମ ହୁଏ ଉଦୟ କୁମାର । ଶୀଳ ପାଲନେର ଫଳେ ବୌଦ୍ଧସ୍ତୁ ରାଜପୁତ୍ର ହେଁ ଜନ୍ମପ୍ରାପଣ କରେନ ।

ଅନୁଶୀଳନମୂଳକ କାଜ

ଅନୁଶୀଳନ ପାଲନେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସୁଫଳ ଛାଡ଼ା ଅନୁବୂପ ଆର କୀ କୀ ସୁଫଳ ପାଓୟା ଯାଏ, ତାର ଏକଟି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର
(ଦଲୀଯ କାଜ) ।

পাঠ : ৮

অষ্টশীল পালনের প্রয়োজনীয়তা

জগত দুঃখময়। তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ। নিয়মিত অষ্টশীল পালন ত্রুষ্ণা দূরীভূত করতে সহায়তা করে। বুদ্ধ দুঃখমুক্তির উপায় স্বরূপ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলো হলো: সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক শৃতি ও সম্যক সমাধি। অষ্টশীল পালনের মাধ্যমে দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করা যায়। গৃহী জীবন সর্বদা জাগতিক চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত। এখানে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও নির্বাণ সম্পর্কে ভাবনার সুযোগ সীমিত। এক্ষেত্রে অষ্টশীল গ্রহণকারী অস্তত একবেলার জন্য হলেও সাংসারিক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত হয়ে অনাগারিক জীবনের স্বাদ লাভ করতে পারেন। এভাবে তিনি ক্রমান্বয়ে নির্বাণের পথে নিজেকে পরিচালিত করতে পারেন। আমাদের চারপাশে অনেক অকুশল কর্মকাণ্ড ঘটতে দেখা যায়। বিশেষ করে হত্যা, চুরি, ব্যভিচার এবং নেশা সেবন বর্তমান সমাজে এক বিরাট সমস্যা। নিয়মিত অষ্টশীল পালনে চিন্ত সংযত হয়। এভাবে আমরা আত্মসংযমের মাধ্যমে অকুশলকর্ম থেকে বিরত থাকতে পারি। ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনযাপন করতে পারি। পারিবারিকভাবে অষ্টশীল পালনের অভ্যাস গড়ে তুললে সুধী পারিবারিক জীবন গঠন করা সম্ভব। এসব বিবেচনা করে বলা যায় অষ্টশীল পালনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

তুমি কি অষ্টশীল পালন প্রয়োজন মনে কর? উভয়ের সমক্ষে যুক্তি দাও।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. গৃহী বৌদ্ধরা সাধারণত পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং অষ্টমী তিথিতে পালন করে।
২. ভিক্ষুকে বন্দনা করে নিকট ত্রিশরণসহ অষ্টশীল প্রার্থনা করতে হয়।
৩. দুপুর মধ্যে আহার সম্পন্ন করতে হবে।
৪. সকলের প্রতি পরায়ণ হতে হবে।
৫. নিয়মিত অষ্টশীল পালন ----- দূরীভূত করতে সহায়তা করে।

মিলকরণ

বাম	ডান
১. অষ্টশীল গ্রহণের পূর্বে	উপোসথিক বলে
২. ত্রৃত্যাই দুঃখের	অভাবগ্রস্ত হয় না
৩. অষ্টশীল গ্রহণকারীকে	আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ
৪. দুঃখ নিরোধের উপায়	মানসিক প্রস্তুতি নিতে হয়
৫. অষ্টশীল পালনের ফলে	মূল কারণ

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. গৃহীরা কখন অষ্টশীল পালন করেন?
২. উপোসথ শীল বলতে কী বোঝা?
৩. অষ্টশীল পালনকারীর পাঁচটি করণীয় বিষয় লেখ।
৪. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গসমূহের নাম লেখ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. অষ্টশীল কী। অষ্টশীল গ্রহণের নিয়মাবলি সম্পর্কে একটি ধারণা দাও।
২. অষ্টশীল গ্রহণকারীর করণীয় বিষয় সম্পর্কে লেখ।
৩. অষ্টশীল পালনের সুফলসমূহ বর্ণনা কর।
৪. বুদ্ধের পূর্বজীবনে উপোসথ শীল পালনের কাহিনি তোমার নিজের ভাষায় তুলে ধর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। ডিক্ষুগণ কয়টি শীল পালন করেন ?

ক) ২২৫	খ) ২২৬
গ) ২২৭	ঘ) ২২৮
- ২। কোন শীলকে উপোসথ শীল বলা হয় ?

ক) পঞ্চশীল	খ) অষ্টশীল
গ) দশশীল	ঘ) পাতিমোক্ষশীল

৩। অনুচ্ছীল প্রার্থনা করা হয় -

- i. বুদ্ধের বন্দনা ও প্রার্থনা করে
- ii. পূজা ও দানীয় সামগ্রী বুদ্ধবেদিতে রেখে
- iii. ভিক্ষু বন্দনা করে ত্রিশরণসহ প্রার্থনা করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i | খ) ii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও -

প্রদীপ বাবুর পরিবারের সবাই মিলে বিশেষ তিথিতে শীল পালনে রত ছিলেন। ঐ দিনই হঠাৎ ঢাকা থেকে এক অতিথি বেড়াতে আসেন। সবাই শীল পালন নিয়ে রত থাকার কারণে অতিথিকে ঠিকমতো আপ্যায়ন করতে পারেননি। অতিথি বিষয়টা বুঝতে পেরে বিহারে গিয়ে শীল গ্রহণ করলেন এবং ধ্যানাবস্থায় গভীর রাতে পেটের যত্নগায় কাতর হলেও কোনোভাবেই শীলভঙ্গ করলেন না।

৪। অনুচ্ছেদের ঘটনাটি কোন মানবের আচরণে পরিলক্ষিত হয় ?

- | | |
|-----------------|--------------|
| ক) দাস-দাসীর | খ) গৃহকর্তার |
| গ) বোধিসত্ত্বের | ঘ) ভিক্ষুর |

৫। উক্ত শীল গ্রহণে অতিথি যে ভাবনায় রত ছিলেন -

- i. শীলানুশৃতি ভাবনা
- ii. বিদর্শন ভাবনা
- iii. সমথ ভাবনা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক) i | খ) ii |
| গ) i ও ii | ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

- ১। পুঙ্গিতা খীসা ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করেন। তিনি পরিষ্কার পোশাক পরিধান করে বিহারে গিয়ে বুদ্ধবেদিতে পূজা ও দান সামগ্রী রেখে শীল গ্রহণ করেন। ভিক্ষুর উপদেশ মতো বুদ্ধের আসনের সামনে বসে প্রার্থনা করেন। তিনি দুপুরের খাবারের পর পানীয় ছাড়া কিছু আহার গ্রহণ করতেন না। এভাবে পুঙ্গিতা খীসার লোভ, দ্বেষ, মোহ দূর হয় এবং মনে প্রশান্তি বিরাজ করে।
- ক) গৃহীরা কোন শীল পালন করেন ?
 খ) শীল পালন বৌদ্ধদের অপরিহার্য নিত্যকর্ম কেন ?
 গ) পুঙ্গিতা খীসা যে শীল পালন করেন, তা ব্যাখ্যা কর।
 ঘ) উক্ত শীল পালনের দ্বারা পুঙ্গিতা খীসার পারিবারিক জীবনে কোন আচরণের প্রতিফলন ঘটবে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও।
- ২। রাজু ও সাজু ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রাজুর পরিবারের সবাই ধর্মীয় কার্যাবলি পালনে সচেতন থাকেন। পক্ষান্তরে সাজুর পরিবার ধর্মের প্রতি তেমন আগ্রহী ছিল না। এতে সাজুর মনে অনুশোচনা বিরাজ করত। একপর্যায়ে সাজু একাকী সারাদিন অনাহারে থেকে ধর্মচর্চা পালন করে। অবশ্যে ধর্মীয় স্মৃতি মনে নিয়ে সাজু মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং মৃত্যুর পর সে সদ্গতি প্রাপ্ত হয়।
- ক) অদিগ্নাদানা শব্দের অর্থ কী ?
 খ) শীল কীভাবে গ্রহণ করতে হয় ? ব্যাখ্যা কর।
 গ) সাজুর আচরণে কোন কাহিনির মিল খুঁজে পাওয়া যায় ? ব্যাখ্যা কর।
 ঘ) রাজু ও সাজু কর্মের দ্বারা কী ফল লাভ করবে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

দান

‘দান’ একটি মহৎ গুণ। মানুষ যে সকল উত্তম ও কল্যাণকর কাজ করে, দান তার মধ্যে অন্যতম। বৌদ্ধধর্মে ‘দান’ অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। দান, শীল ও ভাবনা- এ তিনি প্রকার কুশল কর্মের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত। পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা দান, দানের বৈশিষ্ট্য বা বিবেচ্য বিষয়, দানীয় বস্তু ও দানের সুফল সম্পর্কে জেনেছি। এ অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধধর্মীয় দান অনুষ্ঠান, দান কাহিনি ও দানানুষ্ঠানের গুরুত্ব সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- * বৌদ্ধধর্মীয় বিভিন্ন দানানুষ্ঠানের বর্ণনা দিতে পারব।
- * বিভিন্ন দান কাহিনি বর্ণনা করতে পারব।
- * দানানুষ্ঠানের সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

দানানুষ্ঠান পরিচিতি

বৌদ্ধরা বিভিন্ন ধর্মীয় দান অনুষ্ঠান পালন করেন। যেমন : সংঘদান, অষ্ট পরিষ্কার দান, কঠিন চীবরদান ইত্যাদি। এসব দান অনুষ্ঠানে মূলত ভিক্ষুসংঘকে দান করা হয়। অনুষ্ঠানে অনেক লোক সমবেত হয়ে দানকার্য সম্পাদন করে। লোক-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়, পুণ্য অর্জন এবং নির্বাণ লাভের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধরা দান করে। পরলোকগত জ্ঞাতিদের সদ্গতি কামনায়ও দান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উল্লেখিত দানানুষ্ঠানের মধ্যে সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দান যেকোনো সময় করা যায়। এজন্যে নির্ধারিত কোনো দিন নেই। দাতা প্রয়োজন অনুসারে সাধ্যমতো যেকোনো সময়ে সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দান করতে পারেন। কঠিন চীবরদান শুধুমাত্র প্রতিবছর বর্ষাবাস শেষে প্রবারণা পূর্ণিমার পরদিন হতে এক মাস পর্যন্ত প্রতিদিন বিভিন্ন বিহারে উদ্যাপিত হয়। এ অধ্যায়ে আমরা সংঘদান সম্পর্কে পাঠ করব।

অনুশীলনমূলক কাজ

বৌদ্ধদের দানের উদ্দেশ্য কী?

পাঠ : ২

সংষদান

বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে সংষদান অন্যতম। ভিক্ষুসংঘকে উদ্দেশ্য করে যে দান প্রদান করা হয় তাকে সংষদান বলা হয়। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে যে, একজন ভিক্ষুকে দান করার চেয়ে সংঘকে দান করা খুবই ফলদায়ক।



সংষদান

‘চূল্পবর্গ’ নামক প্রম্ণে ভিক্ষুসংঘকে দান প্রদানের অন্যতম পুণ্যক্ষেত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। যেকোনো সময় এ দানানুষ্ঠান আয়োজন করা যায়। ভিক্ষু, উপাসক, উপাসিকা যে কেউ একক বা সমবেতভাবে বিহারে বা নিজ গৃহে সংষদান অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারেন। সাধারণত উপাসক-উপাসিকাগণ নিজগৃহেই সংষদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বৌদ্ধরা যেকোনো শুভ কাজ আরম্ভ করার আগে সংষদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। যেমন : বিবাহ, নতুন ঘর তৈরি, ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু, বিদেশ গমন, নবজাতকের অন্নপ্রাশন, প্রক্ষেপ প্রভৃতি শুভ কর্মের পূর্বে সংষদান করা যায়। তবে পরিবারের কেউ মৃত্যুবরণ করলে অবশ্যই সংষদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে যে, সংষদানের ফলে মৃত ব্যক্তি সদ্গতি পাও হন। সংষদান করতে হলে কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর উপস্থিতি

প্রয়োজন হয়। সংঘদান অনুষ্ঠানের পূর্বে ভিক্ষুসংঘকে নিমত্তণ করতে হয়। সংঘদানে ভিক্ষুর সংখ্যা যত বেশি হয় তত বেশি ভালো।

সংঘদানে সাধারণত ভিক্ষুসংঘের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ হলো : অন্ন, বন্ধ, ঔষধ, সাবান, তেল, ছাতা, সুচ-সুতা ইত্যাদি। সাধারণত ভিক্ষুসংঘ আহার গ্রহণের পূর্বে এ দানকার্য সম্পাদন করা হয়। সংঘদানের সময় ভিক্ষুসংঘের আসনের সামনে দান সামগ্রী সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। ভিক্ষুসংঘ পরিপাটিভাবে আসনে উপবেশন করলে দান অনুষ্ঠানের কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। দানকার্য পরিচালনা করার জন্য ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ একজন ভিক্ষুকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। প্রথমে ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করা হয়। তারপর উপস্থিত ভিক্ষুদের প্রধান বা তাঁর নির্দেশে অভিজ্ঞ একজন ভিক্ষু সংঘদান গাথা তিনবার আবৃত্তি করেন। গাথাটি নিম্নরূপ:

‘ইদং ভিক্ষুং সপরিক্থারং ভিক্ষু সংঘস্স দেম, পূজেম’

বাংলা অনুবাদ : এই প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য ভিক্ষু সংঘকে দান দিয়ে পূজা করছি।

উপস্থিত সকলে গাথাটি সমস্বরে তিনবার আবৃত্তি করেন। অতঃপর, ভিক্ষুসংঘ সমস্বরে করণীয় মৈত্রী সূত্র, মঙ্গল সূত্র প্রভৃতি পাঠ করেন। তারপর, ‘‘ইদং মে এগাতীনং হোতু, সুখিতা হোত্তু এগাতযো... নিববাণস্স পচযো হোতু’তি (এ পুণ্য আমার জ্ঞাতিগণের মঙ্গালের হেতু হোক, জ্ঞাতিগণ সুখী হোক ...নির্বাণ লাভের হেতু হোক)’ উৎসর্গ গাথাটি তিনবার আবৃত্তি করে সংঘদানের পুণ্যফল জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে দান করতে হয়। উৎসর্গ গাথাকে পুণ্যানুমোদন গাথাও বলা হয়। উৎসর্গ গাথা আবৃত্তিকালে দাতা পরিবারের একজন জল ঢেলে পুণ্যরাশি মৃত জ্ঞাতিসহ সকল প্রাণী ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে দান করে। বুদ্ধ সংঘদানের ফল সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘যুগে যুগে পৃথিবী, সাগর, মেরু প্রভৃতি ক্ষয় হয়ে যায়। কিন্তু শত সহস্র ক঳েও সংঘদানের ফলে অর্জিত পুণ্যরাশি শেষ হয় না।’

অনুশীলনমূলক কাজ

সংঘদান অনুষ্ঠানের দান সামগ্রীর একটি তালিকা তৈরি কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৩

দান কাহিনি

কাহিনি : এক

বৌদ্ধধর্মে দানের বহু কাহিনি প্রচলিত আছে। সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণের আগে তিনি আরও ৫৪৯ বার জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধ হতে গেলে দশ পারমী পূর্ণ করতে হয়। তারমধ্যে দান পারমীর স্থান প্রথম। জন্ম-জন্মান্তরে তিনি অসংখ্য দান করে দান পারমী পূর্ণ করেন। একবার বৌদ্ধিসন্ত শিবি রাজা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। দাতা হিসেবে তাঁর খুব সুখ্যাতি ছিল। দানশীলতা পরীক্ষা করার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র অন্ধ ত্রাঙ্কণের বেশ

ধারণ করে এসে শিবি রাজাকে বললেন, ‘মহারাজ! আপনার দানশীলতার কীর্তি সর্বত্র প্রসারিত। আমি অন্ধ। আপনার দুটি চোখ আছে। আমাকে আপনার একটি চোখ দান করুন।’ অন্ধের প্রতি করুণাবশত রাজা চোখ দান করার সিদ্ধান্ত নেন। চোখ দানের কথা শুনে রাজার সকল প্রিয়পাত্র, নগরবাসী এবং অন্তঃপুরবাসী সমবেত হয়ে রাজাকে চোখ দান করতে বারবার নিষেধ করতে থাকেন। সকলের নিষেধ ও বাধা সত্ত্বেও রাজা অন্ধ ব্রাক্ষণকে তাঁর চোখ দান করার সিদ্ধান্তে সংকল্পবদ্ধ থাকেন। তিনি রাজবৈদ্য সীবককে ডেকে একটি চোখ তোলার নির্দেশ দিলেন। সীবক রাজাকে বললেন, ‘চোখ দান বড় কঠিন কাজ। মহারাজ ! পুনরায় বিবেচনা করুন।’ রাজা তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন এবং সীবককে ডান চোখ তোলার আদেশ দিলেন। সীবক চোখটি তুলে রাজার হাতে দিলেন। রাজা তা অন্ধ ব্রাক্ষণকে দান করলেন। অন্ধ ব্রাক্ষণ চোখটি নিজের অঙ্গকোটের স্থাপন করলেন। তখন চোখটি নীল পদ্মের মতো শোভা পেতে লাগল। রাজা বাম চোখ দিয়ে ঐ দৃশ্য দেখে ভাবলেন, ‘আহা ! আমার চোখ দান সার্থক হলো।’ তিনি পরম শ্রীতি লাভ করলেন এবং অপর চোখটিও ব্রাক্ষণকে দান করলেন। কিছুদিন প্রাসাদে অবস্থান করার পর তিনি ভাবলেন, যে অন্ধ তার রাজ্যের কী প্রয়োজন? অতঃপর তিনি অমাত্যদের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে শ্রামণ্যধর্ম পালনের জন্য উদ্যানে চলে গেলেন। একদিন উদ্যানে বসে তিনি নিজের দানের কথা ভাবতে লাগলেন। অমনি ইন্দ্রের আসন উত্পন্ন হলো। দেবরাজ ইন্দ্র এর কারণ বুঝতে পেরে মহারাজকে বর দিলেন। তখন তিনি পুনরায় দৃষ্টি ফিরে পেলেন। তখন রাজা বললেন :

অঞ্চে দান করে কর ভোজন

তোগ কর, যথা শক্তি করে আগে দান।

পাইবে প্রশংসা হেথা, স্বর্গে পাবে স্থান।

কাহিনি : দুই

গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবণী নগরে সুদত্ত নামে একজন শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। কোনো অনাথ, ভিখারি তাঁর গৃহ থেকে খালি হাতে ফিরে যেতেন না। এজন্যে তিনি অনাথপিণ্ডিক নামে খ্যাত হন।

একসময় তিনি পাঁচশত শকট (পশু চালিত গাড়ি) নিয়ে রাজগৃহ নগরে এক শ্রেষ্ঠী-বৃন্দুর কাছে বেড়াতে গেলেন। সেখানে তিনি জানতে পারলেন জগতে ভগবান বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছেন। এই সংবাদ শুনে তিনি বুদ্ধকে দেখার ইচ্ছা পোষণ করেন। বুদ্ধের ধর্মবাণী শুনে অনাথপিণ্ডিক স্নোতাপন্তি ফল লাভ করেন। তিনি সশিষ্য বুদ্ধকে মহাদান দিলেন এবং শ্রাবণীতে যাবার জন্য নিমত্তণ করলেন। রাজগৃহ হতে শ্রাবণী পঁয়তাল্লিশ যোজন দ্রুরে অবস্থিত। অনাথপিণ্ডিক শ্রাবণীতে ফেরার পথে প্রত্যেক যোজন অন্তর একটি করে বিহার নির্মাণ করান। আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে জেতবন উদ্যান ক্রয় করেন। ঐ উদ্যানে আরও আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে জেতবন বিহার নির্মাণ করেন। ভিক্ষুসংঘসহ বুদ্ধকে তিনি মাসব্যাপী আপ্যায়ন ও সেবার জন্য আরও আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেন। প্রতিদিন তাঁর বাড়িতে পাঁচশত ভিক্ষুকে সেবা দানের ব্যবস্থা ছিল। এই সকল মহাদানের জন্য বুদ্ধ তাঁকে ‘শ্রেষ্ঠ দায়ক’ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

তিনি যখন দুরস্থায় পতিত হয়ে ছিলেন তখনও দান কর্ম করেন নি। বৃক্ষ একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘হে গৃহপতি! তোমার দান কার্য চলছে কি?’ তিনি উত্তরে বলেন যে, তিনি দান করছেন, তবে তা অতি নিকৃষ্ট দান। বৃক্ষ বললেন, চিন্ত উৎকৃষ্ট হলে দান কখনো নিকৃষ্ট হয় না। দাতার চিন্তের উৎকৃষ্টতা এবং প্রতিভার উৎকর্ষতা সব দানকেই উৎকৃষ্ট করে। দানশীলতার কারণে অনাথপিণ্ডিক বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। এখন ও মানুষ শুন্ধাচিত্তে তাঁর দানের কথা স্মরণ করে। এই কাহিনি পাঠ করে আমরা বুঝতে পারি, দানে যশ খ্যাতি বৃক্ষে পায় এবং দানের ক্ষেত্রে বিন্দের চেয়ে চিন্তের উদারতাই বেশি প্রয়োজন।

কাহিনি : তিনি

একদা দাসী পূর্ণা প্রভুর গৃহে সারারাত গৃহকর্ম করার পর তোরে খুব ক্লান্তি ও ক্ষুধা অনুভব করেছিল। তখন সে দু'খানা আধপোড়া রুটি নিয়ে কাছের পুকুর ঘাটে গিয়ে বসল। এমন সময় একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্র হাতে এগিয়ে আসছিলেন। ভিক্ষারত বৌদ্ধ ভিক্ষুকে দেখে পূর্ণার চিন্ত শুন্ধায় পূর্ণ হয়ে গেল। তখন তার মনে ভিক্ষুকে কিছু দান করার ইচ্ছা জাগ্রত হলো। কিন্তু সে ছিল দরিদ্র, হাতের কাছে ঐ দুটি রুটি ছাড়া কিছুই ছিল না। পূর্ণা ভাবলেন, এ পোড়া রুটি কি ভিক্ষু গ্রহণ করবেন? এভাবে দ্বিধাগ্রস্তভাবে তিনি ভিক্ষুর কাছে এগিয়ে গেলেন। ভিক্ষুকে শুন্ধা চিন্তে বদ্ধনা করে তার দানের ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন, ভন্তে! আমার কাছে শুধু দু'খানা রুটি আছে। আমি এগুলো আপনাকে দান করতে চাই। ভন্তে! আপনি কি গ্রহণ করবেন? ভন্তে পূর্ণার দানের আগ্রহ বুঝতে পেরে রুটি গ্রহণে সম্মতি প্রদান করে ভিক্ষাপাত্র এগিয়ে দিলেন। পূর্ণা আনন্দপূর্ণ চিন্তে রুটি দু'খানা ভিক্ষুকে দান করলেন। এ দানের ফলে তিনি শ্রোতাপন্ডি ফল অর্জন করেন। এ কাহিনি পড়েও আমরা জানতে পারি দানের ক্ষেত্রে বিন্দের চেয়ে চিন্ত সম্পদ অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলনমূলক কাজ

দানের ক্ষেত্রে বিস্ত নয়, চিন্ত সম্পদই অধিক গুরুত্বপূর্ণ- আলোচনা কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৪

দানানুষ্ঠানের সামাজিক গুরুত্ব

বৌদ্ধধর্মে দানের সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। দান দেওয়া মানুষের একটি মহৎ গুণ। এই গুণটি বিকশিত করার ক্ষেত্রে দানানুষ্ঠান বিরাট ভূমিকা রাখে। দানানুষ্ঠানের মাধ্যমে দানের অভ্যাস গড়ে উঠে। অহংকার, কৃপণতা, লোভ-দ্বেষ-মোহ প্রভৃতি দূর হয়। চিন্তের উদারতা বাঢ়ে। পরোপকারী মনোভাব সৃষ্টি হয়। অন্যের বিপদে সাহায্যের হাত বাঢ়িয়ে দেওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। দয়া, নিঃস্বার্থপরতা, মেত্রী, প্রেম প্রভৃতি মানবিক গুণের বিকাশ ঘটে। দান, শীল এবং ভাবনার অনুশীলন মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তি দেয়। দান পারমী পূর্ণ না করলে নির্বাণ পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই দশ পারমীর মধ্যে দান পারমীকে প্রথমে স্থান দেওয়া হয়েছে। দানানুষ্ঠান দান ও পারমী পূরণপূর্বক মানুষকে নির্বাণ পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করে।

দান কাহিনি পড়ে আমরা জেনেছি উদার চিত্তে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দান করলে তা উৎকৃষ্ট দান হিসেবে বিবেচিত হয়। সৎ উপায়ে উপার্জিত অর্থ দান করলে অধিক ফল অর্জন হয়। বৌদ্ধধর্মে দাতা ও গ্রহীতা উভয়কে শীলবান হতে হয়। দানানুষ্ঠান শীলবান ও নীতিপরায়ণ হতে সাহায্য করে।

দানানুষ্ঠানে আত্মীয় স্বজন, বস্ত্র-বাস্তব, প্রতিবেশী অংশ গ্রহণ করে। ফলে পারম্পরিক যোগাযোগ ও ভাব বিনিময় হয়। এতে সামাজিক বস্তন দৃঢ় হয়। পরম্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। পারম্পরিক ভুল বোঝাবুঝি, হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়। ফলে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। দান দ্বারা সমাজে অনেক মহৎ কাজ করা যায়। যেমন : শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, অনাথালয় স্থাপন, রাস্তাঘাট, সেতু, জলাধার তৈরি ইত্যাদি। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাও রক্ত দান করা যায়। এ দানের ফলে অনেক মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। দৃষ্টিহীন ব্যক্তি দৃষ্টি ফিরে পায়। ফলে বলা যায়, দানানুষ্ঠান নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এজন্যে সকলের দানানুষ্ঠানের আয়োজন এবং দানানুষ্ঠানে যোগদান করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

দানের দ্বারা তোমাদের এলাকায় কী কী ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার একটি

তালিকা প্রস্তুত কর (দলীয় কাজ)।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. দান' শীল ও ভাবনা এই তিনি প্রকারকর্মের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত।
২. সংঘদান করতে হলে কমপক্ষে ভিক্ষুর উপস্থিতির প্রয়োজন হয়।
৩. উৎসর্গ গাথাকে গাথাও বলা হয়।
৪. একবার শিবিরাজা রূপে জন্মগ্রহণ করেন।
৫. দান দেওয়া মানুষের একটি মহৎ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বৌদ্ধরা কেন দান করে?
২. বৌদ্ধরা কোন কোন ধর্মীয় দান অনুষ্ঠান পালন করে?
৩. সংঘদানে কী কী দান করতে পার?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. কীভাবে সংঘদান করতে হয় বর্ণনা কর।

২. দাসী পূর্ণার স্বাতাপত্তিফল অর্জনের কাহিনি আলোচনা কর।

৩. দান দ্বারা সমাজে অনেক মহৎ কাজ সাধিত হয়- ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। দশ পারমীর মধ্যে প্রথম পারমী কোনটি ?

- | | |
|----------|------------|
| ক) দান | খ) শীল |
| গ) ভাবনা | ঘ) প্রজ্ঞা |

২। দান দেওয়া হয় -

- i. লোভ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয় করার জন্য
- ii. নির্বাগ লাভের জন্য
- iii. অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক) i | খ) ii |
| গ) i ও ii | ঘ) ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রসেনজিং চৌধুরী নতুন বাড়িতে প্রবেশ উপলক্ষে এক দানকর্মের আয়োজন করেন। প্রাঞ্জ ভিক্ষু সংঘদানের বিভিন্ন দিক ও ফল নিয়ে আলোচনায় বলেন-এই দানকর্ম একটি উৎকৃষ্ট ও অধিকতর বেশি পূণ্য কর্ম।
সকলের উচিত এবুগ দান দেওয়া।

৩। প্রসেনজিং চৌধুরীর দানকর্মটি কোন দানের অন্তর্ভুক্ত ?

- | | |
|---------------------|-----------|
| ক) চীবর দান | খ) সংঘদান |
| গ) অষ্টপরিক্ষার দান | ঘ) মহাদান |

৪। অনুচ্ছেদে বর্ণিত দানের ফলে প্রসেনজিং চৌধুরী লাভ করতে পারবেন -

- | | |
|----------------|---------------|
| ক) চিন্ত সুখ | খ) কায় সুখ |
| গ) নির্বাগ সুখ | ঘ) পারমী পূরণ |

সৃজনশীল প্রশ্ন

- ১। চম্পা চাকমা ছেলের জন্য দিন উপলক্ষে বাড়িতে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের নিম্নলিখিত করলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি গান বাজনারও ব্যবস্থা করলেন। এতে তার মা অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বিহার অধ্যক্ষের অনুমতিক্রমে ভিক্ষুসংঘকে উপযুক্ত দান দেবেন। তাই চম্পা মাঝের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য সংঘকে চীবর, ভিক্ষাপাত্রসহ নানা দ্রব্য ও বিহার উন্নয়নের জন্য নগদ অর্থ দান করলেন।
- ক) কত প্রকার কুশল কর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত?
 - খ) দানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
 - গ) চম্পা যে দান করলেন তা কোন দানের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ) চম্পা চাকমার প্রদত্ত দানের গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।
- ২। অনিল চাকমা একজন ধনাত্য ব্যবসায়ী। তার গ্রামে এক যুবকের একটি কিডনী নষ্ট হয়ে গেলে তিনি (অনিল চাকমা) উক্ত যুবকের চিকিৎসার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেন। পক্ষান্তরে সুনিল চাকমা ধনী হলেও তিনি ঐ যুবককে নিজের একটি কিডনী দান করেন। সুনিল চাকমার কিডনী দানের ফলে যুবকটি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল।
- ক) সংঘদানের জন্য কতজন ভিক্ষুর প্রয়োজন?
 - খ) ভিক্ষুসংঘকে দান দেওয়া হয় কেন?
 - গ) সুনিল চাকমার দানটি কোন দানের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে - ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ) অনিল চাকমা ও সুনিল চাকমার দানের ফলাফল পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

সূত্র ও নীতিগাথা

‘নিধিকুণ্ড সূত্র’ ত্রিপিটকের অন্তর্গত খুদকপাঠ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। প্রকৃত সম্পদ বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গৌতম বুদ্ধ নিধিকুণ্ড সূত্রটি দেশনা করেন। অপ্রমাদ বর্গ ত্রিপিটকের ধর্মপদ গ্রন্থে পাওয়া যায়। অপ্রমাদ বর্গে কীভাবে জগতে অপ্রমত্ত বা অবিচল থেকে সংকাজ করা যায় এবং চিন্তকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা বর্ণিত আছে। নিধিকুণ্ড সূত্র এবং অপ্রমাদ বর্গের গাথাগুলো মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণবলির বিকাশ সাধন করে। এ অধ্যায়ের প্রথম অংশে আমরা নিধিকুণ্ড সূত্র এবং দ্বিতীয় অংশে অপ্রমাদ বর্গ পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * নিধিকুণ্ড সূত্রের পটভূমি বর্ণনা করতে পারব।
- * প্রকৃত নিধিসমূহ কী উল্লেখ করতে পারব।
- * সূত্রটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- * অপ্রমাদের ব্যাখ্যা দিতে পারব।
- * অপ্রমত্ত থাকার সুফল মূল্যায়ন করতে পারব।
- * নিধিকুণ্ড সূত্র ও অপ্রমাদ বর্গের তুলনামূলক আলোচনা করতে পারব।

পাঠ : ১

নিধিকুণ্ড সূত্রের পটভূমি

বুদ্ধের সময়ে শ্রাবণস্তীতে এক ধনাট্য শ্রেষ্ঠী বাস করতেন। একদিন তিনি ভিক্ষুসংঘসহ বুদ্ধকে পিণ্ডানে ব্যস্ত ছিলেন। সে সময় কোশল রাজ্যের রাজাৰ অর্থের প্রয়োজন হয়। তিনি শ্রেষ্ঠীকে নিয়ে যাবার জন্য দৃত প্রেরণ করেন। যখন শ্রেষ্ঠী বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের সেবায় ব্যস্ত ছিলেন তখন দৃত এসে তাঁকে রাজাৰ আদেশ জ্ঞাপন করেন। তখন শ্রেষ্ঠী দৃতকে বলেন, ‘এখন যাও, আমি ধন সঞ্চয়ে ব্যস্ত আছি।’ শ্রেষ্ঠী এখানে ধন বলতে পুণ্যসম্পদকে বুঝিয়েছেন। অতঃপর ভগবান বুদ্ধ আহার সমাপ্ত করে পুণ্যসম্পদকে যথার্থ নিধি হিসেবে প্রদর্শন করতে নিধিকুণ্ড সূত্র দেশনা করেন। এ হলো নিধিকুণ্ড সূত্রের পটভূমি।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধ নিধিকুণ্ড সূত্র কেন দেশনা করেছিলেন? বর্ণনা কর।

পাঠ : ২

নির্ধিকুণ্ড সূত্র (পালি ও বাংলা)

১। নির্ধিং নিখেতি পুরিসো গঙ্গীরে ওদকস্তিকে,
অথে কিছে সমুঞ্জন্মে অথায মে ভবিস্সতি ।

বাংলা অনুবাদ : অর্থ কষ্ট উপস্থিত হলে ‘এই অর্থ ভবিষ্যতে কাজে লাগবে’ এরূপ ভেবে লোকে গভীর উদকস্পর্শী গর্তে ধন পুঁতে রাখে ।

২। রাজতো বা দুর্গতস্স চোরতো পীলিতস্স বা,
ইগস্স বা পমোক্খায দুর্ভিক্ষে আপদাসু বা
এতদথায লোকস্মিং নির্ধি নাম নিধীয়তি ।

বাংলা অনুবাদ : রাজার দৌরাত্য, চোরের উৎপীড়ন, ঝণ, দুর্ভিক্ষ ও আপদ থেকে মুক্তির জন্য লোকে ধন পুঁতে রাখে ।

৩। তাৰ সুনিহিতো সন্তো গঙ্গীরে ওদকস্তিকে,
ন সবেবা সববদা এব তস্স তৎ উপকপ্তি ।

বাংলা অনুবাদ : এভাবে গভীর উদকস্পর্শী গর্তে ভালোভাবে ধন পুঁতে রাখলেও তা সব সময় ধন সঞ্চয়িতার উপকারে আসে না ।

৪। নির্ধি বা ঠানা চৰতি সঞ্চাবা'স্স বিমুহ্যতি,
নাগা বা অপনামেতি যক্খা বাপি হৱতি তৎ,

বাংলা অনুবাদ : ধন স্থানচ্যুত হয়, এর স্মৃতি চিহ্ন বিস্মৃত হয়ে যেতে পারে । নাগরা স্থানান্তর করতে পারে, অথবা যক্ষরা হৱণ করতে পারে ।

৫। অঞ্জিয়া বাপি দাযাদা উদ্বৰত্তি অপস্সতো,
যদা পুঞ্চঞ্চকখযো হোতি সববমেতৎ বিনস্সতি ।

বাংলা অনুবাদ : অঞ্জিয় উত্তরাধিকারী (মালিকের) অজ্ঞাতসারে তুলে নিতে পারে, আবার (মালিকের) পুণ্যক্ষয় হলে সমস্ত ধন নষ্ট হয়ে যায় ।

৬। যস্স দানেন শীলেন সঞ্চাগমেন দমেন চ,
নির্ধি সুনিহিতো হোতি ইঞ্জিয়া পুরিসস্স বা

বাংলা অনুবাদ : শ্রীলোক বা পুরুষের দান, শীল, সংযম ও দমনের (নিয়ন্ত্রণ) দ্বারা যে পুণ্যরূপ ধন উত্তমরূপে নিহিত হয় ।

৭। চেতিয়ম্হি চ সঞ্জে বা পুঞ্জলে অতিথিসু বা,
মাতরি পিতরি বাপি অথো জেট্ঠম্হি ভাতরি

বাংলা অনুবাদ : যে ধন চৈত্য নির্মাণ, ভিক্ষুসংঘ, পুদগল, অতিথি, মা, বাবা অথবা জ্যেষ্ঠ আতার সেবায় নিয়োজিত হয়।

৮। এসো নিধি সুনিহিতো অজেয়ে অনুগামিকো,
পহায গমনীয়েসু এতৎ আদায গচ্ছতি ।

বাংলা অনুবাদ : সেই ধনই প্রকৃত সুনিহিত, অজেয় ও অনুগামী হয়, এই ধন নিয়েই মানুষ পরলোকে গমন করে।

৯। অসাধারণমঞ্চেসৎ অচোরহরণো নিধি,
কঘিরাথ ধীরো পুঞ্জানি যো নিধি আনুগামিকো ।

বাংলা অনুবাদ : এই ধনে অন্যের অধিকার নেই, চোরও হরণ করতে পারে না। যে ধন মানুষের অনুগামী হয় পশ্চিত ব্যক্তির তা সম্ভয় করা উচিত।

১০। এস দেবমনুস্মানং সববকামদদো নিধি,
যৎ যদেবাভিপথেন্তি সববমেতেন লব্ভতি ।

বাংলা অনুবাদ : এই ধন দেবতা ও মানুষের সকল কামনা পূর্ণ করে এবং যা যা প্রার্থনা করা হয় এর দ্বারা সেসব লাভ করা যায়।

১১। সুবগ্রতা সুস্মরতা সুস্থিতানসুরূপতা
আধিপচ্চপরিবারো সববমেতেন লব্ভতি ।

বাংলা অনুবাদ : সুন্দর বর্ণ, সুমিষ্ট স্বর, সুন্দর শরীর, সুরূপ, আধিপতি হওয়ার গুণ ও সুপরিবার - সবই এর দ্বারা লাভ করা যায়।

১২। পদেসরজ্জং ইস্সরিযং চক্রবত্তিসুখস্পিযং,
দেবরজ্জম্পি দিবেবসু সববমেতেন লব্ভতি ।

বাংলা অনুবাদ : প্রদেশের রাজত্ত, ঐশ্বর্য, রাজচক্রবর্তীর সুখ, দেবরাজের দিব্য সুখ সবই এর দ্বারা লাভ করা যায়।

১৩। মানুসিকা চ সম্পত্তি দেবলোকে চ যা রতি,
যা চ নিববানসম্পত্তি সববমেতেন লব্ভতি ।

বাংলা অনুবাদ : মনুষ্য লোকের সম্পত্তি, দেবলোকের আনন্দ ও পরম নির্বাণসম্পদ-সবই এর দ্বারা লাভ করা যায়।

১৪। মিত্সম্পদং আগস্মং যোনিসো বে পযুঞ্জতো,
বিজ্ঞাবিমুক্তিবসীভাবো সববমেতেন লব্ভতি ।

বাংলা অনুবাদ : মিত্র সম্পদ লাভ করে যিনি সজ্ঞানে যোগসাধনা করেন, তাঁর বিদ্যা, বিমুক্তি, সমৌধি প্রভৃতি সবকিছু এর দ্বারা লাভ করা যায়।

১৫। পটিসংগ্রহ বিমোক্খা চ যা চ সাবকপারমী,
পচেকবোধি বুদ্ধভূমি সববমেতেন লভ্যতি ।

বাংলা অনুবাদ : প্রতিসংগ্রহ, বিমোক্ষ, শ্রাবকপারমী (বা অর্হত), প্রত্যেক বুদ্ধত্ব, সম্যক সমোধি প্রভৃতি সবকিছু এর দ্বারা লাভ করা যায় ।

১৬। এবং মহিন্দিয়া এসা যদিদং পুঞ্জসম্পদা,
তস্মা ধীরা পসংসন্তি পতিতা কতপুঞ্জতত্ত্বি ।

বাংলা অনুবাদ : এই পুণ্যসম্পদগুলো এমন মহাখন্ধিসম্পন্ন যে এজন্য যিন্দিগুলি পতিতেরা এই পুণ্যসম্পদের প্রশংসা করে থাকেন ।

শব্দার্থ : নিধি - ধন; নিধেতি-পুঁতে রাখা; পুরিসো-পুরুষ; গঁড়িরে-গঁড়ীরে; ওদকন্তিকে- জলসীমা থেকে দূরে মাটির নিচে; (ওদক অর্থ জল), অথে কিচে-অর্থ কটে; সমুপল্লে-সমুৎপন্ন হলে; অথায় মে ভবিসসতি - ভবিষ্যতে এ অর্থ আমার কাজে লাগবে; রাজতো বা দুর্গন্তসস - রাজার দৌরাত্ম্য হলে; চোরতো পীলিতসস বা - চোরের উৎপীড়ন হলে; ইংসস বা পমোক্খায়-খণ্ড উপস্থিত হলে; দুর্ভিক্ষে আপদাসু বা - দুর্ভিক্ষ ও আপদে; এতদথায় লোকশ্মি - এজন্য লোকে; নিধি নাম নিধীয়তে - ধন পুঁতে রাখে; তাব সুনিহিতো সঙ্গে - এভাবে সুনিহিত রাখা সত্ত্বেও; সরোবা - সকল; সববদা- সর্বদা; তসস-তার; উপকঞ্চি - উপকারে; ঠানা-স্থান; চৰতি-চৃত হওয়া; সঞ্জ্ঞাবস্স - স্মৃতিচিহ্নের; বিমুহতি - বিস্মৃত হওয়া; নাগা বা অপনামেতি -নাগেরা অপসারণ করে; যক্খা - যক্ষরা; বাপি-অথবা; হরতি তৎ - তা হরণ করতে পারে; অশ্বিয়া-অশ্বিয়া; দায়াদা- উত্তরাধিকারী; উদ্ধরতি-উদ্ধার করা, উত্তোলন করা; অপস্সতো -অজ্ঞাতসারে; যদা পুঞ্জঞ্জক্ষয়ো - যখন পুণ্যক্ষয়; হোতি - হয়; সববমেতৎ - এসব কিছু; বিনসন্তি- বিনাশ হওয়া; যস্স - যেসব; দানেন - দানের দ্বারা; সীলেন - শীলের দ্বারা; সঞ্জ্ঞাপ্রয়োগ - সংযম দ্বারা; দমেন - নিয়ন্ত্রণ দ্বারা; ইথিয়া - ত্রীগণ; পুরিসা - পুরুষগণ; চেতিয়মিহ - চৈত্য; সঙ্গে - সংঘ; পুগগল - পুদগল; অতিথিসু - অতিথি; অথ - অতঃপর; জেট্টিয়মিহ - বড়; ভাতরি - ভাই; অজেয়ো - অজেয়; অনুগামিকা - অনুগামী; পহায় - ত্যাগ করে; গমনীয়েসু - গমন করে; এতৎ আদায় - এগুলো লাভ করে; অসাধারণমঞ্জেন্দ্রেসৎ- অন্যের অধিকার নেই । অচোরহরণো- চোরে হরণ করতে পারে না; কঘিরাথ-করা উচিত; ধীরো-ধীর; পুঞ্জাণনি - পুণ্যসম্পদ; এস - এই; দেবমনুস্সানৎ - দেবতা ও মানুষ; সববকামদদো - সর্ব কামনা পূর্ণ করা; যদেবাভিপথেতি - যা যা প্রার্থনা করা হয়; লভ্যতি- লাভ করা যায়; সুবংগতা - সুন্দর বর্ণ; সুস্সরতা - সুমিষ্ট স্বর; সুরূপতা -সুরূপ ; সুস্থান - সুন্দর শরীর; অধিপচ্চ - আধিপত্য; পদেসরজং - প্রদেশে রাজত্ব; ইস্সরিয়ৎ - গ্রিশ্বর্য; চক্রবত্তি - চক্রবর্তী; দেবরজস্পি - দেবরাজত্ব ও; দিবেবসু - দিব্য সুখ; মানুসিকা - মনুষ্যলোক; রতি - আনন্দ, সুখ; মিত্রসম্পদং - মিত্রসম্পদ; আগম্য - আগমন; যোনিসো -মনোযোগ; পয়ঃস্তো - যোগ-সাধন; বিজ্ঞা - বিদ্যা; বিমুক্তি - বিমুক্তি; বসীভাবো - বশ্যতা; পটিসংগ্রহ - প্রতিসংগ্রহ, সম্যকভাবে উপলক্ষ; বিমোক্খা - বিমোক্ষ; সাবক - শ্রাবক; পচেক বোধি - প্রত্যেক বুদ্ধত্ব; বুদ্ধভূমি - সম্যক সমোধি; মহিন্দিয়া- মহাখন্ধি; কতপুঞ্জেতৎ পসংসন্তি - কৃত পুণ্যের প্রশংসা করেন ।

পাঠ : ৩

নিধিকুণ্ড সূত্রের তাৎপর্য

‘নিধি’ অর্থ ধন; আর ‘কুণ্ড’ অর্থ নির্জন স্থান। অতএব, নিধিকুণ্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্জন বা গোপন স্থানে ধন সঞ্চয় করে রাখা। সাধারণত ধন বলতে টাকা পয়সা, অলংকার, জমি, গাড়ি, বাড়ি প্রভৃতি বোঝায়। মানুষ ভবিষ্যতের সুখের আশায় এসব ধন সঞ্চয় করে। রাজার দৌরাত্য, চোরের উৎপীড়ন, খণ্ড, দুর্ভিক্ষ ও আপদ হতে মুক্তির নিমিত্ত মানুষ এসব ধন প্রোথিত করে রাখে বা গোপন স্থানে সংরক্ষণ করে রাখে। কিন্তু এসব ধন চুরি, ছিলতাই, আগুন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারণে নষ্ট হতে পারে। অপিয় উত্তরাধিকারীগণের হস্তগত হতে পারে। এসব ধন সব সময় অধিকারীর (মালিকের) উপকার সাধন করতে পারে না। পরলোকে গমন করে না। তা ছাড়া, এরূপ ধনের কারণে হিংসা-বিদ্ধে-লোভ-মোহ সৃষ্টি হতে পারে। প্রাণহানি ঘটতে পারে। পারম্পরিক সুসম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। এসব ধন সুরক্ষিত নয়। তাই বুদ্ধ এগুলোকে প্রকৃত ধন হিসেবে আখ্যায়িত করেননি। নিধিকুণ্ড সূত্রে বুদ্ধ প্রকৃত ধন সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করেন। দান, শীল, ভাবনা এবং আত্মসংযম দ্বারা অর্জিত পুণ্যসম্পদই প্রকৃত ধন। চৈত্য, সংঘ, শীলবান ব্যক্তি, অতিথি, মাতা-পিতা, বরোজেয়ষ্ঠদের সেবায় অর্জিত পুণ্যসম্পদই প্রকৃত ধন। এসব ধন স্বয়ং সুরক্ষিত। এই ধন-সম্পদ কেউ হরণ করতে পারে না, কখনো বিনষ্ট হয় না। প্রয়োজনে উপকারে আসে এবং সবখানে অনুগমন করে। অতএব পুণ্য সম্পদই প্রকৃত এবং সুরক্ষিত ধন।

নিধি বা সম্পদ চার প্রকার :

ক. স্থাবর নিধি : ভূমি, সোনা, হীরা ও মূল্যবান রত্নরাজি, অর্থ, বস্ত্র, পানীয়, অন্ন বা এরূপ বিনিয়য়যোগ্য বা হস্তান্তরযোগ্য সম্পদ।

খ. জঙ্গাম নিধি : দাস-দাসী, হাতি, গরু, ঘোড়া, গাঢ়া, ছাগল, ভেড়া, কুকুর ইত্যাদি পশু।

গ. অঙ্গ সম নিধি : কর্ম, শিল্প, বিদ্যা, শান্ত্র জ্ঞান এরূপ যা কিছু শিখে অর্জন করতে হয় এবং শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

ঘ. অনুগামী নিধি : দানময়, শীলময়, ভাবনাময়, ধর্ম শ্রবণময়, ধর্মদেশনাময় পুণ্য যা সবখানে সব সময় অনুগমন করে সুখ লাভের কারণ হয়।

নিধিকুণ্ড সূত্র পড়ে বোঝা যায়, ভোগসম্পদের চেয়ে পুণ্যসম্পদ অর্জন করাই শ্রেয়। সুতরাং নিধিকুণ্ড সূত্রের তাৎপর্য অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

প্রকৃত নিধি বলতে কী বোঝ?

শ্রেষ্ঠীর উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

পাঠ : ৪

অপ্রমাদ বর্গের পটভূমি

অপ্রমাদ বর্ণে ১২টি গাথা আছে। বুদ্ধ গাথাগুলো বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে ভাষণ করেছিলেন। ফলে ধারণা করা যায় যে, অপ্রমাদ বর্গের গাথাগুলোর ভিন্ন ভিন্ন পটভূমি রয়েছে। এখন অপ্রমাদ বর্গের গাথাগুলোর পটভূমি সম্পর্কে জানব।

জানা যায়, বুদ্ধ অপ্রমাদ বর্ণের ১ নং গাথা থেকে ৩ নং গাথা ভাষণ করেছিলেন কৌশাস্তীর অস্তর্গত ঘোষিতারামে অবস্থানকালে। সে সময় মহারাজা উদয়নের প্রধান মহিষী ছিলেন শ্যামাবতী। তিনি ছিলেন বুদ্ধভক্ত। তিনি প্রতিদিন বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণের জন্য ঘোষিতারামে যেতেন। রাজার অপর রানি ছিলেন মাগদ্ধিয়া। কিন্তু তিনি ছিলেন বুদ্ধ বিদেশী। তিনি রানি শ্যামাবতীর বুদ্ধভক্তি একবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তাই তিনি রাজাকে রানি শ্যামাবতীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা বিফল হলো। কোনো ক্ষতি করতে না পেরে অবশেষে রানি মাগদ্ধিয়া রানি শ্যামাবতীর প্রাসাদে আগুন লাগালেন। পাঁচশ সহচরীসহ রানি শ্যামাবতী আগুনে পুড়ে মারা গেলেন। ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেয়ে গেলে রাজা উদয়ন রানি মাগদ্ধিয়াকে প্রাণদণ্ডের বিধান দিলেন। এ কাহিনি শুনে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের উপদেশছলে প্রথম তিনটি গাথা ভাষণ করেছিলেন।

কুষ্ঠঘোষক নামে রাজগৃহে এক ধরী গৃহস্থ ছিলেন। পিতৃ-মাতৃহীন কুষ্ঠঘোষক অনেক সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনো বিলাসিতা করতেন না। তিনি সৎভাবে কঠিন পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এজন্য রাজা বিষিসার তাঁকে শ্রেষ্ঠী উপাধি দিয়ে পুরস্কৃত করেন এবং তাঁর কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেন। একদিন রাজা বিষিসার কন্যা এবং জামাতাকে বুদ্ধের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁদের সব কথা খুলে বলেন। বুদ্ধ তা শুনে পরিশ্রমী আর উদ্যোগী ব্যক্তিদের প্রশংসা করে ৪নং গাথাটি ভাষণ করেন।

রাজগৃহের অধিবাসী মহাপন্থক ভিক্ষুবৃত গ্রহণ করার অল্প সময়ের মধ্যেই অর্হত লাভ করেন। তখন তিনি তাঁর কনিষ্ঠ আতা চুল্লপন্থককে ভিক্ষুবৃতে দীক্ষা প্রদান করেন এবং তাবলেন সহজে তাঁরও মুক্তি লাভ হবে। চুল্লপন্থক কিন্তু মেধাবী ছিলেন না। দীর্ঘ চার মাস চেষ্টা করেও তিনি একটি গাথা মুখস্থ করতে পারেন নি। ভাইয়ের বুদ্ধির জড়তায় ক্ষুব্ধ হয়ে মহাপন্থক তাঁকে ভিক্ষুসংঘ ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দিলেন। ভাইয়ের নির্দেশে তিনি খুব ভোরে যখন বিহার ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন তখন বুদ্ধ তাঁকে দেখতে পেলেন। চলে যাবার কারণ শুনে বুদ্ধ তাঁকে একখণ্ড কাপড় দিয়ে বললেন, সূর্য উঠলে সূর্যের দিকে তাকিয়ে কাপড়টি নাঢ়বে। তিনি তা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে হাতের ঘাম লেগে কাপড়টি ময়লা হয়ে গেল। চোখের সামনে ক্ষণিকের মধ্যে কাপড়টির অবস্থার পরিবর্তন দেখে তিনি জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করলেন। তারপর অপ্রমত হয়ে সাধনায় অর্হতফল লাভ করেন। বুদ্ধ তাঁর প্রশংসা করে ৫ নং থেকে ৭ নং গাথা ভাষণ করেছিলেন।

বুদ্ধ যখন শ্রাবণ্তীর জেতবনে অবস্থান করেছিলেন তখন তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম মহাকশ্যপ থের পিঙ্গলী গুহায় ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। সে সময় তাঁর মানসপটে বুদ্ধের এই বাণী, ফুটে উঠল - জীবগণের উৎপত্তি আর বিনাশ দুর্জেয়। মাতৃগতে জন্মলাভ করার পর মাতা-পিতার অজ্ঞাতেই কত জীবের মৃত্যু ঘটছে তা একমাত্র সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি জানেন। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ ৮ নং গাথাটি ভাষণ করেছিলেন।

বুদ্ধের উপদেশ শুনে দুই ভিক্ষু ধ্যান সাধনার জন্য বনে গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন প্রমাদ এবং আলস্যের কারণে ধ্যান সাধনায় বেশি দূর অস্থসর হতে পারলেন না। অন্যজন অপ্রমত্ত থেকে অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে ধ্যান সাধনা করতে লাগলেন এবং অর্হত লাভ করলেন। সাধনা শেষ হলে উভয়ে বুদ্ধের কাছে ফিরে এসে যাঁর যেমন ফল লাভ হয়েছে তা বললেন। তাঁদের কথা শুনে বুদ্ধ ৯ নং গাথাটি ভাষণ করেছিলেন।

বৈশালীর কৃটাগ্রারশালায় একদিন বুদ্ধ মহালি লিছবীকে দেবরাজ ইন্দ্রের পূর্ব জন্মকথা শোনাচ্ছিলেন। পূর্বের এক জন্মে ইন্দ্র তেরিশজন যুবক নিয়ে এক ষেছাসেবক দল গড়েন। তাঁরা মাতা-পিতা ও গুরুজনের সেবা, নগরে ও গ্রামে আবর্জনা পরিষ্কার, সর্বসাধারণের জন্য রাস্তাধাট নির্মাণ ইত্যাদি কল্যাণকর্মে রত থাকতেন। মৃত্যুর পর তাঁরা সকলে স্বর্গ লাভ করেন এবং ইন্দ্র দেবরাজ হন। এই কাহিনির সূত্র ধরে বুদ্ধ ১০ নং গাথাটি ভাষণ করেছিলেন।

বুদ্ধ জেতবনে অবস্থানকালে এক ভিক্ষু তাঁর নিকট ধ্যান শিক্ষা করে বনে গিয়ে ধ্যান অভ্যাস করতে লাগলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও ফল লাভ না হওয়ায় তিনি বুদ্ধের নিকট ফিরে যাচ্ছিলেন। পথে এক বিরাট দাবায়ি তাঁর গতিরোধ করল। তিনি দেখলেন ভীষণ আগুন তাঁর সমস্ত কিছুকে পুড়িয়ে ধ্বংস করতে দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছে। এই দৃশ্য তাঁর মনে নতুন উৎসাহ ও প্রেরণা এনে দিল। এ আগুনের মতোই তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্নকে জয় করে সাধন পথে এগিয়ে যাবার সংকল্প করলেন। তাঁর সংকল্পের কথা জানতে পেরে বুদ্ধ ১১ নং গাথাটি ভাষণ করেছিলেন।

ভিক্ষু তিষ্য শ্রাবণ্তীর কাছেই নিগম গ্রামে বাস করতেন। বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর কোনো সংশ্বর ছিল না, বললেই হয়। নিজের কয়েকজন আজীয়-স্বজনের কাছে ভিক্ষা করে যা পেতেন তাতেই তাঁর প্রয়োজন মিটত। এর বেশি কিছুর আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। তাই অনাধিপিণ্ডিকের মতো শ্রেষ্ঠাদের মহাদান বা কোশলরাজ প্রসেনজিতের আরও বড় দান- উৎসবে তিষ্যকে কখনো দেখা যায়নি। এ নিয়ে লোকে তাঁকে নিদা করত এবং বলত তিষ্য শুধু তাঁর স্বজনদেরই ভালোবাসেন। বুদ্ধ তিষ্যের এই অল্পে তুষ্টি আর লোভহীনতার কথা শুনে তাঁর অনেক প্রশংসা করে অপ্রমাদ বর্গের ১২ নং গাথাটি ভাষণ করেছিলেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

অপ্রমাদ বর্গের ১নং থেকে ৩ নং গাথা বুদ্ধ কাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করেছিলেন?

এবং কেন করেছিলেন বল।

৫ নং থেকে ৭ নং গাথার পটভূমি বর্ণনা কর।

পাঠ : ৫

অপ্রমাদ বর্গ (পালি ও বাংলা)

১. অঞ্চলিক অমতৎ পদং পমাদো মচুনো পদং

অঞ্চলিক মীয়ত্তি যে পমতা যথা মত।

বাংলা অনুবাদ : অপ্রমাদ অমৃতের পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ। অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা অমরত্ত লাভ করেন, কিন্তু যারা প্রমত্ত তারা বেঁচে থেকেও মৃত্যু।

২. এতৎ বিসেসতো গুরুত্ব অপ্রমাদমৃতি পদ্ধিতা,
অপ্রমাদে পমোদত্তি অরিযানৎ গোচরে রতা।

বাংলা অনুবাদ : এ সত্য বিশেষজ্ঞপে জেনে পদ্ধিতগণ অপ্রমত্ত হয়ে আর্যদের (বা শ্রেষ্ঠদের) পথ অনুসরণ করে থাকেন এবং অপ্রমাদে পমোদিত হন।

৩. তে বাযিনো সাততিকা নিচ্ছৎ দলহৃ পরক্ষমা,
কুসন্তি ধীরা নিববানৎ যোগক্ষেমৎ অনুভূতৰৎ।

বাংলা অনুবাদ : যাঁরা ধ্যানপরায়ণ, সব সময় উদ্যোগী ও নিত্য দৃঢ় পরাক্রমশালী সেই ধীর ব্যক্তিগণ সর্বশ্রেষ্ঠ যোগক্ষেম নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন।

৪. উট্ঠানবতো সতিমতো সুচিকম্ভস্স নিসম্ভকারিনো,
সঞ্জ্ঞতস্স চ ধৰ্ম জীবিনো অপ্রমত্তস্স যসোহভি বড়চতি।

বাংলা অনুবাদ : যিনি উৎসাহী, স্মৃতিমান ও সুবিবেচক, যিনি সংযত ইন্দ্রিয়, ধর্মপরায়ণ ও উদ্যমশীল তাঁর যশ ক্রমশই বাড়ে।

৫. উট্ঠানেন'প্রমাদেন সঞ্জ্ঞমেন দমেন চ,
দীপৎ কথিরাথ মেধাবী যৎ ওঘো নাভিকীরতি।

বাংলা অনুবাদ : উদ্যোগ, অপ্রমাদ, সংযম এবং (ইন্দ্রিয়) দমন দ্বারা মেধাবী ব্যক্তি যে দ্বীপ রচনা করেন প্লাবণ তাকে ধ্বনি করতে পারে না।

৬. পমাদ মনুযুজন্তি বালা দুমেধিনো জনা,
অপ্রমাদঞ্চ মেধাবী ধনৎ সেটঠঁ'ব রক্খতি।

বাংলা অনুবাদ : অঙ্গ ও দুর্মতি লোকেরা প্রমাদযুক্ত (অনবধান, আলস্যপরায়ণ) হয়। কিন্তু যিনি মেধাবী তিনি অপ্রমাদকে (অবধান, তৎপরতা) শ্রেষ্ঠ ধনের মতো রক্ষা করেন।

৭. মা পমাদৎ অনুযুঞ্জেথ, মা কামরতি সন্থঘৎ,
অপ্পমত্তোহি বাযিতো পাঞ্জোতি বিপুলৎ সুখৎ।

বাংলা অনুবাদ : প্রমাদে অনুরক্ত হয়ো না, কামসন্ত্ত হয়ো না। অপ্রমত্তভাবে যিনি ধ্যান করেন তিনি বিপুল সুখ লাভ করেন।

৮. পমাদৎ অপ্পমাদেন যদানুদত্তি পদ্ধিতো,
পঞ্জেণা পাসাদ মারুয়হ অসোকো সোকিনিং পজৎ,

পরবর্তটোর ভূমিটো ধীরো বালে অবেক্ষতি ।

বাংলা অনুবাদ : যখন পদ্ধিত ব্যক্তি অপ্রমাদ দ্বারা প্রমাদকে দূর করেন, তখন তিনি প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করেন, নিজে শোকহীন হয়ে শোকগ্রস্ত লোকদের অবলোকন করেন, যেমন পর্বত শিখরস্থ ধীর ব্যক্তি ভূমিতে স্থিত সব লোকদের দেখেন ।

৯. অঞ্চলিক পমতেসু সুন্তেসু বহু জাগরো,
অবলসসংব সীঘসুসো হিঙ্গা যাতি সুমেধসো ।

বাংলা অনুবাদ : বেগবান ঘোড়া যেমন দুর্বল ঘোড়াকে পিছনে ফেলে যায়, মেধাবী ব্যক্তিও তেমনি প্রমতদের মধ্যে অপ্রমত এবং নিন্দিতদের মধ্যে জাগ্রত থেকে ধর্মপথে এগিয়ে চলেন ।

১০. অঞ্চলাদেন মধবা দেবানং সেট্টঠতঃ গতো,
অঞ্চলৎ পসংসন্তি পমাদো গরহিতো সদা ।

বাংলা অনুবাদ : ইন্দ্র অপ্রমাদ অর্থাৎ কর্তব্যকর্মে অবিচল নিষ্ঠা দ্বারা দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন । তাই পদ্ধিতগণ অপ্রমাদের প্রশংসা করেন । প্রমাদ সব সময় গর্হিত বা নিন্দনীয় ।

১১. অঞ্চলাদরতো ভিক্খু পমাদে ভয দস্সি বা,
সঞ্চারেজনং অনুং থূলং ডহং অগৃগীব গচ্ছতি ।

বাংলা অনুবাদ : যে ভিক্ষু অপ্রমাদে রত বা প্রমাদে ভয়দর্শী, তিনি সূক্ষ্ম ও স্থূল ছোট বড় সমস্ত সংযোজনকে (বা ক্ষেত্রকে) আগন্তের মত দগ্ধ করতে করতে এগিয়ে যান ।

১২. অঞ্চলাদ রতো ভিক্খু পমাদে ভয দস্সি বা,
অভবেবা পরিহানায নিববানস্সেব সন্তিকে ।

বাংলা অনুবাদ : যে ভিক্ষু অপ্রমাদে রত থেকে প্রমাদকে সফলে পরিহার করেন, তিনি ধর্মের পথ থেকে ভ্রষ্ট হন না । তিনি নির্বাণের কাছেই অবস্থান করেন ।

শব্দার্থ : অঞ্চলাদো - অপ্রমাদ; অমতপদং- অমৃতের পথ; পমাদো - প্রমাদ; মচুনো পদং - মৃত্যুর পথ; যে পমতা - যারা প্রমত; তে যথামতা - তারা মৃতের মতো; অঞ্চলিক - অপ্রমত ব্যক্তিগণ মরেন না; অঞ্চলাদম্ভি - অপ্রমাদে; বিসেসতো এওড়া - এর বিশেষত্ব জেনে; পদ্ধিতা অরিয়ানং গোচরে রতা - পদ্ধিতগণ আর্যদের আচরিত ধর্মে রত থাকেন; অঞ্চলাদে পমোদতি - অপ্রমাদে প্রমোদিত হন; দলহপরক্কমা - দৃঢ় পরাক্রম; তে ধীরা - সেই ধীর ব্যক্তিগণ; অনুত্তং - সর্বশ্রেষ্ঠ; যোগকথেমং নিববানং- যোগক্ষেম নির্বাণ; কুস্সনি - স্পর্শ করেন, লাভ করেন; উট্ঠানবতো-উথানশীল; সতিমতো- স্মৃতিমান; সুচিক্ষয়স্স- শুচিকর্মযুক্ত; নিস্সম্মকারিনো- বিশেষ বিবেচনা সহকারে কর্ম সম্পাদনকারী; সঞ্চারতস্স - সংযত; ধমজীবিনো -ধর্মপরায়ণ; অঞ্চলিকস্স চ - এবং অপ্রমত ব্যক্তির;

বসো ভিবড়চতি - যশ বর্ষিত হয়; উট্ঠানেন - উথান, জাগরণ দ্বারা; অপ্রমাদ দ্বারা; সঞ্চারণেন - সংযম দ্বারা; দমনে চ - এবং দমন দ্বারা; মেধাবী - মেধাবী; দীপৎ কবিরাখ - দীপ নির্বাণ করেন; যৎ - যাকে; ওঁযো প্লাবন; ন অভিকীরতি - বিষ্টস্ত করতে পারে না; দুষ্মেধিনো জন্ম - অজ্ঞ ও দুর্বৃক্ষি লোকেরা; পমাদৎ অনুযুগ্রজন্তি - প্রমাদে অনুরক্ত হয়; অপ্রমাদঞ্চ মেধাবী ধনৎ সেচ্ছাত্থ - আর জ্ঞানী অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের ন্যায়; রক্খিতি - রক্ষা করে; পমাদৎ মা অনুযুগ্রজেথ - প্রমাদে অনুরক্ত হবে না; কামরতিসহ্বৎ মা - কামরতি সঞ্চাগে আসন্ত হবে না; অপ্রগমত হি বায়ত্তো- অপ্রমতভাবে যিনি ধ্যান করেন; বিপুলৎ সুখৎ পৃষ্ঠপোতি - তিনি বিপুল সুখ লাভ করেন; যদা পত্তিতো - যখন পত্তিত ব্যক্তি; অপ্রমাদেন পমাদৎ মুদতি - অপ্রমাদ দ্বারা প্রমাদকে দূর করেন; অসোকো - শোকহীন; পঞ্চাঙ্গপাসাদমারুহ - প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করে; ভূম্পটচ্ছে - ভূমিস্থিত; সোকিনিং বালে পজৎ (শোকসন্তপ্ত মূর্খ প্রজাদের; পৰবত্তট্টো'ব - পৰ্বতে অবস্থিত; ধীরো ইব - ধীর ব্যক্তির ন্যায়; অবেক্খিতি - অবলোকন করন; সুমেধসো - মেধাবী ব্যক্তি; পমতেসু অপ্রমতো - প্রমতদের মধ্যে অপ্রমত থেকে; সুন্তেসু বহুজাগরো - সুন্তদের মধ্যে সদাজাগ্রত থেকে; অবলস্সৎ হিত্তা - দুর্বল অশ্বকে অতিক্রমকারী; সীঘস সো ইব - দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায়; যাতি - যান বা অগ্রসর হন; মঘবা - ইন্দ্র; অপ্রমাদেন - অপ্রমাদ দ্বারা; দেবানৎ - দেবতাদের মধ্যে; সেচ্ছাতৎ গতো - শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন; অপ্রমাদৎ পসংসন্তি - অপ্রমাদকে প্রশংসা করেন; পমাদো সদা গরহিতো - প্রমাদ সর্বদা নিন্দনীয় বা গর্হিত; অপ্রমাদরতো - অপ্রমাদপরায়ণ; পমাদে ভয়দস্সি বা - বা প্রমাদে ভয়দশী; ভিক্খু - ভিক্ষু; অগ্রগি ইব - অগ্নির মত; অগুৎ থুলৎ সূক্ষ্ম ও স্থূল; সঞ্চেজন, বক্ষন; গচ্ছতি - অগ্রসর হন; পরিহানায অভব্বো - ধৰ্মপথ পরিহার না করে; নিবানসুসেব সন্তিকে - নির্বাণের নিকটবর্তী হন।

পাঠ : ৬

অপ্রমাদ বর্ণের তাৎপর্য

‘অপ্রমাদ’ শব্দের অর্থ হচ্ছে উদ্যম, উৎসাহ, উথানশীলতা, পরাক্রম, জাগ্রতভাব, স্মৃতিমান, সংযমশীলতা ইত্যাদি। অপ্রমাদ বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি ও মূলনীতি। নির্বাণ লাভের জন্য অপ্রমাদ অত্যাবশ্যক। ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন’ সূত্রে অপ্রমাদকে জ্ঞান মার্গ লাভের সোপান বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বর্ণিত বুদ্ধের অন্তিম উপদেশসমূহের সারকথাই হচ্ছে অপ্রমাদ। বুদ্ধ বলেছেন, ‘যত প্রকার সবল প্রাণীর পদচিহ্ন আছে তার মধ্যে হাতির পদচিহ্ন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এবূপ কুশল কর্মের মধ্যে অপ্রমাদই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।’ অপ্রমাদ ব্যক্তিত স্মৃতির অনুশীলন সম্ভব নয়। অপ্রমাদ স্মৃতিকে জাগ্রত করে। যাঁরা স্মৃতিকে জাগ্রত রাখেন তাঁরা নির্বাণ লাভ করেন।

অপ্রমাদ বর্ণে অপ্রমত এবং প্রমত ব্যক্তির স্বরূপ সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। যিনি অবিচল থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে সংকোজ করেন তিনি অপ্রমত ব্যক্তি। অপ্রমত ব্যক্তি রাগ-দ্বেষ-মোহ দ্বারা বশীভূত হন না। তিনি সর্বদা জাগ্রত থাকেন। ধর্মাচরণে তৎপর থাকেন। কর্তব্যকর্মে অবিচল থাকেন এবং সর্বদা কুশলকর্ম সম্পাদন করেন। তিনি সংযত, শান্ত, অচঞ্চল, ধীর এবং প্রজ্ঞাবান হন। তিনি জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল ছিন্ন করে নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন। এজন্য তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। অপরাদিকে, প্রমত ব্যক্তি অসংযত, অস্থির এবং আলস্যপরায়ণ হন। সে রাগ-দ্বেষ-মোহ দ্বারা বশীভূত হয়। সে হিংসা ও আক্রমণের বশে অন্যের ফতি করে। প্রমাদ তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

তার পক্ষে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল ছিল করা সম্ভব নয়। সে নির্বাণ লাভ করতে পারেন না। প্রমত্ত ব্যক্তির অবর্ণ, অকীর্তি, দুর্নাম দৈনন্দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এজন্য প্রমত্ত ব্যক্তি জীবিত থেকেও মৃত্যু। বুদ্ধগণ প্রমাদকে সর্বদা নিন্দা করেন। অপ্রমাদকে সর্বদা প্রশংসা করেন।

অপ্রমাদ বর্গের সঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত আছে। কথিত আছে, নিষ্ঠোধ শ্রমণের মুখে অপ্রমাদ বর্গের গাথা শুনে সন্ত্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরামর্শে সন্ত্রাট অশোক প্রতিদিন ষাট হাজার ভিস্কুর নিত্য আহার ও পথের ব্যবস্থা করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মদূত প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার, স্তুপ, স্তুভ নির্মিত হয়েছিল। তিনি অনুশাসন আকারে বুদ্ধবাণী পর্বতগাত্রে এবং স্তম্ভে লিখে রাখতেন। সন্ত্রাট অশোকের অনুশাসনের মূলকথাও ছিল অপ্রমাদ। এতে বোৰা যায়, অপ্রমাদ বর্গের গুরুত্ব অপরিসীম। অতএব সকলের অপ্রমাদপরায়ণ হওয়া উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

‘অপ্রমাদ’ শব্দের অর্থ কী?

অপ্রমাদ ও প্রমাদের মধ্যে পার্থক্যসমূহ চিহ্নিত কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৭

‘নিধিকুণ্ড সূত্র’ এবং ‘অপ্রমাদ বর্গের’ তুলনামূলক আলোচনা

সূত্র ও নীতিগাথাসমূহ থেকে বুদ্ধের উপদেশ ও নৈতিক জীবন গঠনের নির্দেশনা পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে আমরা ত্রিপিটকের অন্যতম অংশ সূত্রপিটকের ‘খুদকপাঠ’ ও ‘ধর্মপদ’ গ্রন্থ হতে সংকলিত ‘নিধিকুণ্ড সূত্র’ এবং ‘অপ্রমাদ বর্গ’ পাঠ করেছি। এই সূত্র ও নীতিগাথা দুটি তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় উভয়ই আমাদের নৈতিক জীবন গঠনের নির্দেশনা দেয়। যেমন-খুদকপাঠ গ্রন্থে বর্ণিত ‘নিধিকুণ্ড সূত্র’ প্রকৃত ধন-সম্পদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের শিক্ষা দেয়। এতে কুশলকর্মের দ্বারা অর্জিত পুণ্যরাশিকে প্রকৃত সম্পদ বলা হয়েছে। প্রকৃত সম্পদ বা পুণ্যরাশি দান, শীল, ভাবনা, আত্মসংযম দ্বারা অর্জন করতে হয়। সৎ কাজের মাধ্যমে পুণ্যফল অর্জিত হয়। সৎকাজ বা কুশলকর্ম সম্পাদনের জন্য সব সময়ই মনোযোগী ও অপ্রমত্ত হতে হয়।

ধর্মপদে বর্ণিত ‘অপ্রমাদ বর্গে’ বুদ্ধ অপ্রমত্ত হয়ে কুশলকর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন। ধীর-স্থির, প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই কুশলকর্ম সম্পাদন সম্ভব। তিনিই কুশলকর্ম সম্পাদন করে প্রকৃত নিধি বা সম্পদ অর্জন করতে পারেন।

ফর্মা নং ৭, বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ৭ম

‘নিধিকুণ্ড সূত্র’ পাঠ করে আমরা প্রকৃত সম্পদ কী তার ধারণা অর্জন করি। অপ্রমাদ বর্গ পাঠ করে ঐ প্রকৃত সম্পদ বা পুণ্যরাশি কীভাবে অর্জন করা যায় তা জানতে পারি। প্রমত্ত ব্যক্তি কুশলকাজ করতে পারেন। ফলে পুণ্যফলও লাভ করতে পারে না।

নিধিকুণ্ড সূত্র ও অপ্রমাদ বর্গ পাঠ করে আমরা নৈতিক জীবনযাপন বলতে কী বোঝায় এবং নৈতিক জীবন গঠন কীভাবে করতে পারি তার দিক নির্দেশনা পাই। নিধিকুণ্ড সূত্রে বর্ণিত সকল কাজই নৈতিক জীবন গঠনের উপাদান আর অপ্রমাদ বর্গে ঐ কাজগুলি সম্পাদন করতে যেরূপ আচরণ অনুশীলন করতে হয় অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ, দীর্ঘা, লোভ ও মোহমুক্ত হয়ে সংযম চর্চা করতে বলা হয়েছে। এভাবেই অপ্রমত্ত হয়ে কুশলকাজ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

নিধিকুণ্ড সূত্র ও অপ্রমাদ বর্গের শিক্ষা জীবনে অনুসরণ করলে কুশলকর্ম সম্পাদনপূর্বক পুণ্যসম্পদ সঞ্চয় করা সম্ভব। এভাবেই বৌদ্ধধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্বাণ পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. শ্রেষ্ঠী এখানে ধন বলতে ----- বুঝিয়েছেন।
২. হলে সমস্ত ধন নষ্ট হয়ে যায়।
৩. পুণ্য সম্পদই প্রকৃত এবংধন।
৪. নিধি বা সম্পদপ্রকার।
৫. অপ্রমাদ বর্গেটি গাথা আছে।
৬. মহা রাজা উদয়নের প্রধান মহিয়ী ছিলেন.....।

মিলকরণ

বাম	ডান
১. পুণ্য সম্পদই প্রকৃত	প্রশংসা করেন
২. নিধি অর্থ	শ্রেয়
৩. ভোগসম্পদের চেয়ে পুণ্যসম্পদ অর্জনই	ধন
৪. অপ্রমাদকে সর্বদা	দুর্জেয়
৫. জীবগণের উৎপত্তি আর বিনাশ	সম্পদ

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নির্ধিকুণ্ড সূত্রের শিক্ষা কী সংক্ষেপে লেখ ?
২. অনুগামী নির্ধি কী সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ ?
৩. ভিক্ষু তিষ্য কে? তাঁর সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. নির্ধিকুণ্ড সূত্র অনুযায়ী প্রকৃত ধন কী আলোচনা কর।
২. অপ্রমাদ বর্গের ৫ নং ও ৭ নং গাথার পটভূমি বর্ণনা কর।
৩. প্রমত্ত ব্যক্তির কী পরিণাম ভোগ করতে হয় ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নির্ধিকুণ্ড সূত্র ট্রিপিটকের কোন গ্রন্থে বর্ণিত ?

ক. মজুবিম নিকায়	খ. সংযুক্ত নিকায়
গ. খুদকপাঠ	ঘ. অঙ্গুত্তুর নিকায়
২. সূত্র পাঠ করার মাধ্যমে লাভ করা যায় –
 - i. পুণ্য সম্পদ
 - ii. ধন সম্পদ
 - iii. বিপদ থেকে পরিত্রাণ
- নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i	খ. ii
গ. i ও ii	ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় ও ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও –

মধুপুর বিহারের ভিক্ষুরা প্রায়ই ধ্যান সাধনার জন্য গভীর বনে অবস্থান করতেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ত্রৈয়ার কারণে সাধনা পূর্ণ করতে পারেননি। কিন্তু শীলভদ্র ভিক্ষু শীল অনুশীলন ও মনের তীব্র ইচ্ছায় ধ্যান সাধনা দ্বারা ইন্দ্রিয়কে জয় করলেন।

৩. শীলভদ্র ভিক্ষুর ধ্যান সাধনায় সূত্র ও নীতিগাথার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে ?

ক. প্রমত্ত ভাব	খ. আলস্যভাব
গ. অপ্রমত্ত ভাব	ঘ. নিষ্ঠাভাব
৪. উক্ত কর্মের প্রভাবে শীলভদ্র কী লাভ করবেন ?

ক. শ্রোতাপত্তি ফল	খ. অনাগামীফল
গ. সক্রদ্দাগামী ফল	ঘ. অহিত্ত ফল

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ঘটনা-১ মিতা ও শিল্পী মুৎসুদী দুই সহপাঠি। মিতা অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিল। অপরদিকে শিল্পী মোটেও মিতার ধর্মপরায়ণতা সহ্য করতে পারত না। তাই মিতাকে সব সময় অত্যাচার নির্যাতন করত। এত সবের পরও সে শিল্পীকে কোনো কষ্ট দিত না। একদিন শিল্পী মিতার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাকে পুড়িয়ে মারল। এমন কাজের জন্য শিল্পীকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হলো।

ঘটনা-২ ফুলতলী গ্রামের নিরুম অরণ্যে বিকাশ চাকমা ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। বাইরের জগতের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন না। তাঁর আত্মায় স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল। তাঁরা সাহায্য সহযোগিতা করে তাঁর প্রয়োজন মেটাত। তাঁর আচরণে এলাকাবাসী সন্তুষ্ট ছিল না।

- ক. অপ্রমাদ বর্ণে কতটি গাথার উল্লেখ আছে ?
- খ. অপ্রমাদ বর্ণের গাথাগুলোর মাধ্যমে কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা যায়, ব্যাখ্যা কর।
- গ. ঘটনা-১ অপ্রমাদ বর্ণের কোন গাথার ইঙ্গিত বহন করে।
- ঘ. ঘটনা-২ অপ্রমাদ বর্ণের ১২ নম্বর গাথার প্রতিচ্ছবি তুমি কি বক্তব্যটির সাথে একমত যুক্তি দাও।

২. মনিকা চাকমা স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তিনি বিহারে ভিক্ষুদের সেবায় নিয়োজিত হন। তিনি কোনো প্রকার শীল ভঙ্গ না করে পুণ্য সংরক্ষণ করেন।

- ক. নিধি কত প্রকার?
- খ. অনুগামী নিধি কীভাবে লাভ করা যায়?
- গ. মনিকা চাকমার সন্তানরা কীভাবে পুণ্য সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে? নিধিকূল সূত্রের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মনিকা চাকমার ঘটনা নিধিকূল সূত্রের প্রতিফলন- এর যথার্থতা ব্যাখ্যা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

জগৎ দুঃখময়। কঠোর তপস্যা কিংবা ভোগবিলাস দ্বারা দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। বুদ্ধ দুঃখ নিরোধের উপায় হিসেবে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দেশনা করেছেন। এটিকে মধ্যম পথ বলা হয়। তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ। তৃষ্ণার কারণে মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ ভোগ করে থাকে। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন দ্বারা তৃষ্ণা ক্ষয় করে নির্বাণ লাভ করা যায়। যিনি নির্বাণ লাভ করেন তিনি জন্মগ্রহণ করেন না। যিনি জন্মগ্রহণ করেন না তিনি জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ ভোগ করেন না। তাই সকলের দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। এ অধ্যায়ে আমরা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- * আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বর্ণনা করতে পারব।
- * দুঃখ নিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- * আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের ধর্মীয় গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারব।

পাঠ : ১

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পরিচিতি

‘মার্গ’ শব্দের অর্থ পথ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলতে বোঝায় বুদ্ধ নির্দেশিত আটটি সম্যক বা সঠিক পথ। এই আটটি সম্যক পথ হলো :

- (১) সম্যক দৃষ্টি
- (২) সম্যক সংকল্প
- (৩) সম্যক বাক্য
- (৪) সম্যক কর্ম
- (৫) সম্যক জীবিকা
- (৬) সম্যক স্মৃতি
- (৭) সম্যক ব্যায়াম
- (৮) সম্যক সমাধি।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : শীল, চিত্ত, প্রজ্ঞা। সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক জীবিকা শীলের অন্তর্গত। নৈতিক জীবন গঠনের জন্য এগুলো অনুশীলন করতে হয়। সম্যক শূতি, সম্যক ব্যায়াম ও সম্যক সমাধি চিত্তের অন্তর্গত। চিত্তের উৎকর্ষ ও একাহাতা সাধনের জন্য এগুলো অনুশীলন করতে হয়। সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প প্রজ্ঞার অন্তর্গত। প্রজ্ঞা বা পরম জ্ঞান অর্জনের জন্য সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্পের অনুশীলন করতে হয়। পরবর্তী পাঠে আমরা এই আটটি পথ সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।

অনুশীলনমূলক কাজ

আটটি সম্যক পথের নাম বল।

পাঠ : ২

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ব্যাখ্যা

সম্যক দৃষ্টি : সম্যক দৃষ্টির অর্থ হলো সত্য বা অভ্রাত দৃষ্টি, যথার্থ জ্ঞান এবং চারি আর্য সত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বা উপলব্ধি। অবিদ্যার কারণে মানুষ জীব জগৎ সম্পর্কে মিথ্যা দৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে তাতে আবদ্ধ থাকে। সূর্যের আলো যেমন অন্ধকার দূর করে তেমনি সম্যক দৃষ্টি মিথ্যাদৃষ্টি দূর করে। তৃক্ষার কারণে মানুষ বার বার জন্মাবহণ করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু সম্যক দৃষ্টি না থাকায় আমরা দুঃখ সত্যকে চিনতে পারিনা। মিথ্যাদৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখে পরিণামে আরও দুঃখ ডেকে আনি। সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কুশলকর্ম নির্ণয় করতে পারেন। তিনি সর্বদা কুশলকর্ম সম্পাদন করেন এবং অকুশলকর্ম হতে বিরত থাকেন। তিনি জ্ঞানী। জগৎকে তিনি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা তিনি বিভ্রান্ত হন না।

সম্যক সংকল্প : সম্যক সংকল্পের অর্থ হলো সঠিক বা উন্নত সংকল্প; সঠিক কাজ করার ইচ্ছা। সৎ জীবন যাপনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়াই সম্যক সংকল্প। এজন্য ভোগবিলাস, লোভ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি বর্জনের সংকল্প করতে হয়। অপরদিকে, মৈত্রী, করুণা, পরোপকার প্রভৃতি কুশলকর্ম সম্পাদনের সংকল্প করতে হয়। এভাবে অকুশল বর্জন করে কুশলকর্ম সম্পাদনপূর্বক সত্যজ্ঞান অনুসারে জীবনযাপনের দৃঢ় ইচ্ছা বা সংকল্পই হচ্ছে সম্যক সংকল্প। পদ্ধিতগণ সর্বদা সম্যক সংকল্প গ্রহণ করে থাকেন।

সম্যক বাক্য : যথার্থ এবং গ্রহণযোগ্য বাক্যই হচ্ছে সম্যক বাক্য। মিথ্যা, কর্কশ, অসার, পরনিন্দা, সত্য গোপন, বৃথা বাক্য বর্জন করে সংযত, সুমিষ্ট, সুভাষিত সার বাক্যই সম্যক বাক্য। যে বাক্য অপরকে দুঃখ দেয় তা সর্বতোভাবে বর্জন করা উচিত। সত্য, শুভ, প্রীতিপদ ও অর্থপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করা উচিত। সম্যক বাক্য দ্বারা মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

সম্যক কর্ম : সঠিক এবং কুশলকর্মই হলো সম্যক কর্ম। যে কর্ম নিজের ও অপরের মঙ্গল সাধন করে, ক্ষতি সাধন করে না তা-ই সম্যক কর্ম। প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ, নেশাদ্রব্য গ্রহণ প্রভৃতি

ଅକୁଶଳକର୍ମ ବର୍ଜନ କରେ ନିର୍ଦୋଷ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରାଇ ସମ୍ୟକ କର୍ମ । ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀରେ ଜନ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସଜ୍ଜେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନଇ ସମ୍ୟକ କର୍ମ । ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନେର ମାଧ୍ୟମେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ହୟେ ସଂ କାଜ କରାଇ ସମ୍ୟକ କର୍ମ । ସତତାର ସଜ୍ଜେ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଲନ କରାଇ ସମ୍ୟକ କର୍ମ ।

ସମ୍ୟକ ଜୀବିକା : ନୈତିକଭାବେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରାଇ ହଲୋ ସମ୍ୟକ ଜୀବିକା । ବୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତ୍ର, ବିଷ, ପ୍ରାଣୀ, ମାଂସ ଏବଂ ନେଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଏ ପଞ୍ଚ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ସଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରତେ ଉପଦେଶ ଦିୟେଛେ । ମାନୁଷ ଓ ପ୍ରାଣିକୁଳର ଜନ୍ୟ ମଞ୍ଜଳ ଓ ସେବାମୂଳକ ସେ କୋନୋ କାଜଇ ସମ୍ୟକ ଜୀବିକା ।

ସମ୍ୟକ ବ୍ୟାୟାମ : ସଂ ଉଦ୍ୟମ ବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକେ ସମ୍ୟକ ବ୍ୟାୟାମ ବଲା ହୟ । ସମ୍ୟକ ବ୍ୟାୟାମ ଚାରଭାବେ ଅନୁଶୀଳନ କରତେ ହୟ । ଯଥା : ୧. ଉତ୍ପନ୍ନ ଅସଂକର୍ମ ବିନାଶେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ; ୨. ଅନୁଃପନ୍ନ ଅସଂକର୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନ ନା ହୋଯାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ; ୩. ଅନୁଃପନ୍ନ ସଂକର୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନେର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ୪. ଉତ୍ପନ୍ନ ସଂକର୍ମ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା । ସମ୍ୟକ ଉଦ୍ୟମ ବା ସଂ ଇଚ୍ଛା ନା ଥାକଲେ ଜଗତେ କୋନୋ କାଜଇ ସଫଳ ହୟ ନା । ସଂ ଉଦ୍ୟମ ଛାଡ଼ା କଲ୍ୟାଣକର କାଜ ସଂଘଟିତ ହତେ ପାରେ ନା । ଆମାଦେର ଚିତ୍ତ ସଦୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସର୍ବତ୍ର ବିଚରଣଶୀଳ । ଅନ୍ତିର ଚିତ୍ତକେ ସଂୟତ ରାଖା ଏବଂ ସଠିକ ପଥେ ପରିଚାଲିତ କରାଇ ସମ୍ୟକ ବ୍ୟାୟାମ ।

ସମ୍ୟକ ସ୍ୱତି : କୁଶଳକର୍ମେର ଚିତ୍ତାଇ ସମ୍ୟକ ସ୍ୱତି । ଦୈହିକ ଓ ମାନସିକ ସକଳ ଅବସ୍ଥାଯ ସଚେତନଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଇ ସମ୍ୟକ ସ୍ୱତି । ସମ୍ୟକ ସ୍ୱତି କୁଶଳ ଚେତନାକେ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରାଖେ । ଚିତ୍ତକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । କୁଶଳ ଓ ଅକୁଶଳ କର୍ମେର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝାତେ ସହାଯତା କରେ । ଅକୁଶଳକର୍ମ ବର୍ଜନ କରେ କୁଶଳକର୍ମ କରାର ଚିତ୍ତା କରାଇ ସମ୍ୟକ ସ୍ୱତି । ସ୍ୱତିହୀନ ମାନୁଷ ମାର୍ବିବିହୀନ ନୌକାର ମତୋ ।

ସମ୍ୟକ ସମାଧି : ଚିତ୍ତେର ଏକାଥାତା ସାଧନଇ ସମ୍ୟକ ସମାଧି । ଚନ୍ଦ୍ରଲ ଚିତ୍ତକେ ସଂୟତ କରାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଇ ହଚ୍ଛେ ସମାଧି । ଚିତ୍ତ ସଂୟତ ନା ହଲେ କୋନୋ କାଜ ସଠିକଭାବେ ସମ୍ପାଦନ ସନ୍ତ୍ଵନ ନଯ । ତାଇ ସକଳେର ସମାଧି ଚର୍ଚା କରା ଉଚିତ ।

ଅନୁଶୀଳନମୂଳକ କାଜ

ସମ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟି ବଲାତେ କୀ ବୋବା?

ସମ୍ୟକ ଜୀବିକାର ଧାରଣା ଦାଓ ।

ପାଠ : ୩

ନୈତିକ ଜୀବନ ଗଠନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ

ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ଅନୁଶୀଳନେର ମାଧ୍ୟମେ ନୈତିକ ଜୀବନ ଗଠନ ଏବଂ ଦୁଃଖ ହତେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରା ଯାଇ । ଲୋଭ-ଦେଷ-ମୋହ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅକୁଶଳ ଏବଂ ଅନୈତିକ କର୍ମେର ମୂଳ ଭିତ୍ତି । ଭାସ୍ତ ଧାରଣାର କାରଣେ ମାନୁମେର ମଧ୍ୟେ ଲୋଭ-ଦେଷ-ମୋହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୟ । ଫଳେ କୁଶଳ-ଅକୁଶଳ କର୍ମ ନିର୍ଧାରଣ କରତେ ନା ପେରେ ମାନୁଷ ଅନୈତିକ କର୍ମେ ଲିଙ୍ଗ ହୟ । ସମ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟି ଭାସ୍ତ ଧାରଣା ଦୂର କରେ ଅନୈତିକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହତେ ବିରତ ରାଖେ ଏବଂ ନୈତିକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନେ ଉଦ୍ଧୁଦ୍ଧ କରେ । ସମ୍ୟକ ସଂକଳ୍ପେର ମାଧ୍ୟମେ ମାନୁଷ ସଂ ଜୀବନଯାପନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ୟ ହୟ । ସମ୍ୟକ ବାକ୍ୟ କରକ୍ଷ, ମିଥ୍ୟା, ପିଶୁନ ଏବଂ ଅସାର କଥା ବଲା ହତେ ସେମନ ବିରତ ରାଖେ, ତେମନି ସତ୍ୟ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁଭାଷିତ

কথা বলতে উদ্বৃদ্ধ করে। সম্যক কর্ম সকল প্রকার অকুশলকর্ম হতে বিরত রাখে এবং কুশল কর্ম করতে উৎসাহিত করে। সম্যক জীবিকা অহিতকর জীবিকা পরিত্যাগ করে কুশলকর্ম অবলম্বনের দ্বারা সৎ জীবিকা নির্বাহ করতে প্রেরণা জোগায়। সম্যক ব্যায়াম উৎপন্ন অসৎকর্মের বিনাশ করে কুশলকর্ম উৎপাদন ও সম্পাদনে সচেষ্ট করে। অকুশল কর্ম অনুৎপাদন ও বর্জনের চেষ্টা করতে শিক্ষা দেয়। সম্যক স্মৃতি কুশল কর্ম সম্পাদনের চেতনাকে জাগ্রত রাখে। সম্যক সমাধি চিন্তকে সমাহিত ও সংযত করে কুশল ও নেতৃত্ব কর্মে নিবিষ্ট রাখে। এ থেকে বোৰা যায় যে, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রতিটি মার্গ মানুষকে নেতৃত্ব জীবন গঠনে সহায়তা করে। অতএব, নেতৃত্ব জীবন গঠনে সকলেরই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নেতৃত্ব জীবন গঠনে সঠিক দিক নির্দেশনা – যৌক্তিকতা নিরূপণ কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৪

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ধর্মীয় গুরুত্ব

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বৌদ্ধধর্মের অন্যতম মূলতত্ত্ব। তথাগত বুদ্ধ জগতের দুঃখ মুক্তির উপায় হিসেবে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের উপদেশ দিয়েছেন। দুঃখ মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে, কঠোর শারীরিক কষ্ট কিংবা ভোগবিলাসে নিমগ্ন থাকা কেনোটিই দুঃখ হতে মুক্তির উপায় হতে পারে না। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এই দুইটি চরম পন্থাকে বর্জন করে। তাই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বৌদ্ধধর্মে মধ্যমপন্থা হিসেবে পরিচিত। বুদ্ধ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেই অর্হত্ব ফল লাভ করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি ত্রুণার ক্ষয় সাধন করে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল হতে মুক্ত হন এবং পরম সুখ নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন। বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাণ। ত্রুণার কারণে মানুষ বারবার জন্মাঘৃণ করে দুঃখ ভোগ করে। ত্রুণার কারণে মানুষ বারবার জন্মাঘৃণ করে দুঃখ ভোগ করে। ত্রুণার ক্ষয় সাধন বা নির্বাপিত অবস্থাই নির্বাণ। নির্বাণপ্রাপ্তি ব্যক্তি পুনরায় জন্মাঘৃণ করেন না। ফলে তিনি জন্মাজনিত দুঃখ ভোগ করেন না। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হচ্ছে নির্বাণ লাভের উপায়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সঠিকভাবে অনুশীলন করলে বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য নির্বাণ লাভ সম্ভব। সংসার জীবনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনকারী ব্যক্তি যাবতীয় অকুশল কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত থেকে ধর্মপথে পরিচালিত হন। সংসার ত্যাগী বৌদ্ধত্বিক্ষু শ্রমণরা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে অর্হত্ব ফল লাভ করে নির্বাণে উপনীত হন। তাই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম এবং বৌদ্ধ মাত্রই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

বিতর্ক অনুষ্ঠান

বিষয় : ‘শুধুমাত্র সংসার ত্যাগী সাধকের পক্ষেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন সম্ভব’।

ଅନୁଶୀଳନୀ

ଶୂନ୍ୟମୟାନ ପୂରଣ

୧. ‘ମାର୍ଗ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ..... ।
୨.କାରଣେ ମାନୁଷ ବାରବାର ଜଳାହଳ କରେ ।
୩. ଯିନି ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରେ ତିନି କରେନ ନା ।
୪. ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ବାକ୍ୟଇ ହଛେ ।
୫. କର୍ମର ଚିନ୍ତାଇ ସମ୍ୟକ ଶୃତି ।

ମିଳକରଣ

ବାମ	ଡାନ
୧. ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗକେ ବଲା ହୁଏ	ସମ୍ୟକ ବାକ୍ୟ
୨. ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ବାକ୍ୟଇ ହଛେ	ତୃଷ୍ଣା
୩. ଦୁଃଖେର ଏକମାତ୍ର କାରଣ	ମଧ୍ୟମ ପଥ
୪. କୁଶଳ କର୍ମର ଚିନ୍ତାଇ	ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ
୫. ନିର୍ବାଣ ଲାଭେର ଉପାୟ	ସମ୍ୟକ ଶୃତି

ସଂକଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ

୧. ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗକେ ମଧ୍ୟମ ପଥ ବଲା ହୁଏ କେଳ?
୨. ସମ୍ୟକ ବାକ୍ୟ କୀଭାବେ ବଲା ଯାଇ?
୩. କଯେକଟି କୁଶଳକର୍ମେର ଉଦାହରଣ ଦାଓ ।

ବର୍ଣନାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ

୧. ଆର୍ଯ୍ୟ-ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ବଲତେ କୀ ବୋକା ବର୍ଣନା କର ।
୨. ସମ୍ୟକ ଜୀବିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
୩. ‘ବୁଦ୍ଧ ନିର୍ଦେଶିତ ଆଟଟି ସଠିକପଥ ଅନୁସରଣ କରେ ଦୁଃଖ ଥେକେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରା ଯାଇ’- ଆଲୋଚନା କର ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মার্গ শব্দের অর্থ কী ?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. লক্ষ্য | খ. উদ্দেশ্য |
| গ. ধ্যান | ঘ. পথ |

২. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করার অন্যতম কারণ কোনটি ?

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ক. ধন সম্পদ অর্জন | খ. বিলাস জীবন যাপন |
| গ. পার্থিব সুখ লাভ | ঘ. নেতৃত্ব জীবন গঠন |

নিচের উচ্চীপক্ষটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও-

কৌশিক ধীর ও মিতভাষী হওয়ার কারণে সহপাঠীদের কাছ থেকে প্রায়ই বিভিন্ন কষ্টস্থূলি শুনতে হতো। তারপরেও সহপাঠীদের প্রতি সে মৈত্রীভাব পোষণ করত। বিদ্যালয়ের সমাপনী পরীক্ষায় সে প্রথম স্থান লাভ করে এবং শৃঙ্খলার জন্য সে সেরা শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়।

৩. কৌশিকের আচরণে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কোন পথটিকে নির্দেশ করে ?

- | | |
|-----------------|----------------|
| ক. সম্যক দৃষ্টি | খ. সম্যক সংকলন |
| গ. সম্যক কর্ম | ঘ. সম্যক শৃতি |

৪. উক্ত কর্মের ফলে কৌশিক অর্জন করতে পারে -

- i. জ্ঞান মার্গ
- ii. কুশলকর্ম নির্ণয়
- iii. ভাস্তু ধারণা নিরসন।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সুমন ও বুমন দুই প্রতিবেশী। এদের মধ্যে পেশায় সুমন একজন সৎ ব্যবসায়ী এবং বুমন দারিদ্র কৃষক। সুমন কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং মানুষের সাথে প্রতারণা করে। এ ছাড়া বিভিন্ন ক্লাবে গিয়ে জুয়া খেলে ও নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করে। পক্ষান্তরে বুমন কাজে ফাঁকি দেয় না, সৎভাবে পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে। বুমনের আচরণে গ্রামের লোকজন তাকে খুব পছন্দ করে।
 - ক. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কত প্রকার ?
 - খ. সম্যক সমাধি বলতে কী বোঝা ?
 - গ. সুমনের আচরণে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কোন অঙ্গ লজ্জিত হয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. বুমনের কর্মটি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সম্যক জীবিকার প্রতিফলন-ভূমি কি বক্তব্যটির সঙ্গে একমত ? মতামত দাও।
২. রাহুল ভাবুক প্রকৃতির এক যুবক। তিনি সব সময় জীবের প্রতি সদয় থাকতেন এবং মন্দ কাজ ত্যাগ করে ভালো কাজ করার চিন্তা করতেন। কিন্তু সংসারের দুঃখ-কষ্ট অনুধাবন করতে পেরে একপর্যায়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। কিছুদিন পর তিনি প্রচণ্ড জ্বরের কারণে মৃত্যুবন্ধনা অনুভব করতে লাগলেন। শেষে ধ্যান-সাধনার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠলে তিনি দুঃখ মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন।
 - ক. সম্যক কর্ম কী ?
 - খ. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে লেখ।
 - গ. কোন মার্গ অবলম্বনের মাধ্যমে রাহুল অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছেন ? বর্ণনা কর।
 - ঘ. রাহুল প্রব্রজ্যা জীবন গ্রহণের মাধ্যমে কতটুকু সফল হয়েছিলেন? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

সপ্তম অধ্যায়

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব

বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের স্বতন্ত্র ইতিহাস ও পটভূমি রয়েছে। এসব আচার অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও দর্শনের সাথে সম্পৃক্ষ। ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে এ অনুষ্ঠানগুলো পালন করা হয়। নানামূল্যী আয়োজনে কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান উৎসবের রূপ ধারণ করে। এসব আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হয়। ধর্মীয় মতবাদগুলো বুঝতে সহজ হয়। পারম্পরিক ভাব-বিনিময় হয়। সৌভাগ্য-ভূক্তবোধ সৃষ্টি হয়। নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠিত হয়। আত্মসংযম এবং বিনোদন হওয়া যায়। বর্ষাবাস, উপোসথ এবং কঠিন চীবরদান প্রভৃতি অনুষ্ঠান বৌদ্ধদের ধর্মীয় সংস্কৃতির অন্য উৎস। এসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ভিক্ষু এবং গৃহী বৌদ্ধদের মধ্যে সম্পর্কের সেতুবন্ধন রচনা করে। এ অধ্যায়ে আমরা তিনটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- * পটভূমিসহ বর্ষাবাসব্রত ব্যাখ্যা করতে পারব।
- * বর্ষাবাসব্রতকালীন ভিক্ষু ও গৃহীদের করণীয় বিষয় বর্ণনা করতে পারব।
- * উপোসথের প্রকারভেদ ও উপোসথ পালনের নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- * কঠিন চীবরদানের সুফল উল্লেখপূর্বক কঠিন চীবরদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

বর্ষাবাসব্রত

বর্ষাবাস বৌদ্ধদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় আচার বা অনুষ্ঠান। ভগবান বুদ্ধ তাঁর সংঘ প্রতিষ্ঠার পর সুষ্ঠুভাবে সেই সংঘ পরিচালনার নিমিত্তে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেন। বর্ষাবাস বুদ্ধ প্রবর্তিত বিধি-বিধানেরই অংশ। আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাস ভিক্ষুরা বর্ষাবাসব্রত পালন করেন। এ সময় তাঁরা বিহারে অবস্থান করে ধর্মালোচনা, ধর্মশ্রবণ, ধর্ম-বিনয় ও ধ্যান-সমাধি চর্চা এবং অধ্যয়ন করে সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করেন। বর্ষাকালে বিহারে বাস করে এই ব্রত বা অধিষ্ঠান পালন করা হয় বলে এটিকে বর্ষাবাসব্রত বলে। বর্ষাবাসব্রত পালনের মাধ্যমে ভিক্ষুদের জ্যৈষ্ঠতা নির্ধারণ করা হয়।

বর্ষাবাসব্রতের পটভূমি

ভিক্ষুসংঘ গঠন করার পর বুদ্ধ সর্বপ্রাণির কল্যাণের জন্য তাঁর ধর্মবাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে ভিক্ষুদের নির্দেশ দেন। বুদ্ধের নির্দেশে ভিক্ষুগণ পায়ে হেঁটে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে বিভিন্ন লোকালয়ে গিয়ে ধর্ম প্রচার ও দেশনা করতেন। কিন্তু বর্ষাকালে ভিক্ষুরা বিভিন্ন রকম অসুবিধা ভোগ করতেন। তাঁরা কর্দমাক্ত পথে যাতায়াতের সময় প্রচুর

কষ্ট ভোগ করতেন। পোকা-মাকড় এবং সাপের দংশনে অনেকের প্রাণ সংহার হতো। ঝড়-বৃষ্টিতে ভেজার কারণে নানারকম রোগ হতো। ভেজা কাপড় পরে থাকতে হতো। কারণ তখনে দায়ক-দায়িকদের নিকট থেকে চীবর গ্রহণের নিয়ম প্রচলন হয়নি। ফলে ভিক্ষুসংঘ নানারকম জটিল রোগে আক্রান্ত হতেন। তা ছাড়া বর্ষাকালে ভিক্ষুদের যাতায়াতে অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেক সবুজ তৃণ এবং ক্ষুদ্র প্রাণী ভিক্ষুদের পদদলিত হতো। বুদ্ধ রাজগৃহের বেণুবন বিহারে অবস্থানকালে এসব বিষয় জ্ঞাত হন। তখন তিনি বর্ষা ঋতুর তিন মাস অর্থাৎ আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথি থেকে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত বিহারে বসবাস করে ধর্মালোচনা, ধর্ম শ্রবণ, ধ্যান-সমাধি এবং বিদ্যাচর্চা করে অতিবাহিত করার জন্য ভিক্ষুদের নির্দেশ দেন। তখন থেকে বর্ষাবাস উদ্যাপন শুরু হয়। বর্ষাবাসব্রতকালে ভিক্ষুসংঘ কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক পরিশুল্কিতা অর্জন করেন। তাই বর্ষাবাসব্রতকে আত্মশুল্কিতা অধিষ্ঠান বলা হয়।

বুদ্ধ বলেছেন, যে স্থানে উপযুক্ত দায়ক-দায়িকা থাকেন এবং যে স্থান ধ্যান-সাধনার অন্তরায় নয় সেখানে ভিক্ষুদের বর্ষাবাসব্রত পালন করা উচিত। বুদ্ধের সময়কালে প্রাচীন ভারতের উরুবেলা, রাজগৃহ, নালন্দা, পাটলিপুত্র, শ্রাবণ্তী, সাকেত, পাবা প্রভৃতি বর্ষাবাসব্রতের জন্য উপযুক্ত স্থান ছিল।

বর্ষাবাসব্রতের বিধান

তিন মাস যে কোনো একটি বিহারে অবস্থান করে ভিক্ষুদের এই বর্ষাবাসব্রত উদ্যাপন করতে হয়। তখন তাঁরা অধ্যয়ন, ধ্যান-সাধনা ও ধর্মচর্চা করে দিন অতিবাহিত করেন। কোনো জরুরি কাজে নিজ বিহার থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে সম্ব্যায় আগেই বর্ষাবাস উদ্যাপনকারী ভিক্ষুকে নিজ বিহারে ফিরে আসতে হয়। তবে কিছু কারণে বর্ষাবাসের সময় নিজ বিহার ছাড়াও অন্যত্র রাত্রি যাপন করা যায়। কারণগুলো হলো :

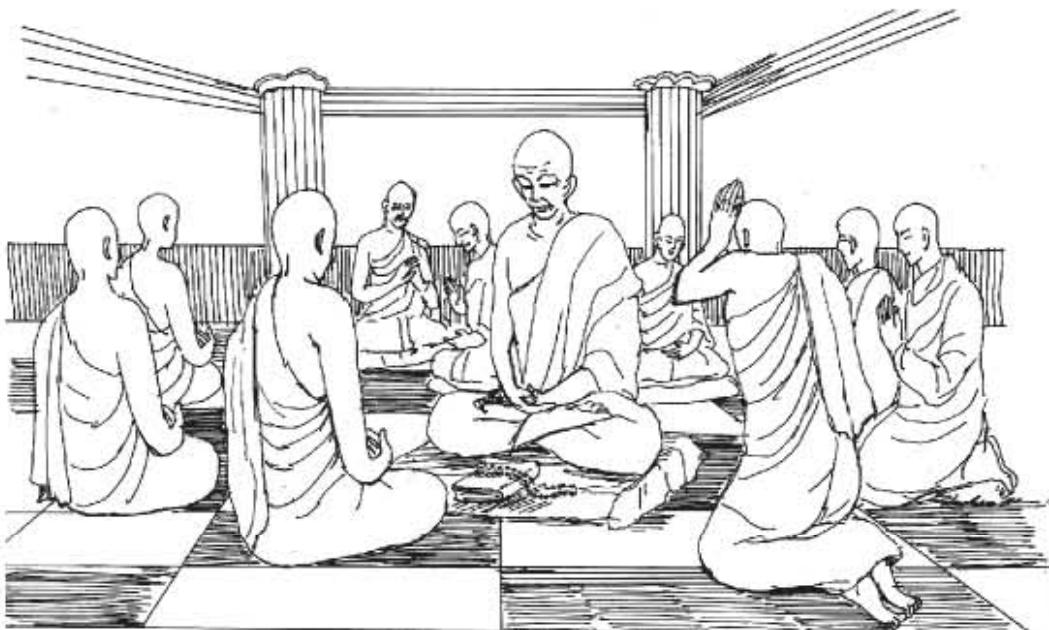
১. অসুস্থ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, শ্রমণ এবং বুগ্ণ দায়ক-দায়িকা দেখার জন্য।
২. বুদ্ধশাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীকে উপদেশ দেবার জন্য।
৩. কোনো উপাসক বা উপাসিকা সংঘের উদ্দেশ্যে বিহার নির্মাণ করলে তাতে সহযোগিতা ও উৎসর্গ অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য।
৪. বর্ষাবাসব্রতধারী ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী, শ্রমণ বা শ্রমণী অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য।
৫. কোথাও মিথ্যাদৃষ্টি বা সন্দেহ উপস্থিত হলে বা কেউ মানসিক বিকারগ্রস্ত হলে তা দূর করার জন্য।
৬. পরিবাস কর্ম, আহবান কর্ম, প্রব্রজ্যা দান প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য।

ওপরে বর্ণিত কারণে বর্ষাবাসব্রতের সময় বাইরে অবস্থান করা গেলেও এক সঙ্গাহের মধ্যে বর্ষাবাস পালনকারী ভিক্ষুকে বিহারে ফিরে আসতে হয়। তবে বন্য জরু, সাপ, চোর-ডাকাতের উপদ্রব, বিহারের দায়ক-দায়িকারা বিবাদগ্রস্ত এবং তক্ষিয় হলে, আগুন, পানি, বন্যা, ঝড় প্রভৃতি কারণে বর্ষাবাসের স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হলে বর্ষাবাসের স্থান পরিবর্তন করা যাবে। এতে ভিক্ষুদের বর্ষাবাসব্রত লঙ্ঘন হয় না।

বর্ষাবাসস্তুতে ভিক্ষুদের করণীয়

বর্ষাবাস ভিক্ষুদের অবশ্য পালনীয় একটি কর্ম। এ সময় ভিক্ষুদের অনেক করণীয় কর্ম থাকে। তা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

- ১। বর্ষাবাসস্তুত পালনকালে ভিক্ষুদের শাস্ত্র অধ্যয়ন, ধ্যান-সমাধি চর্চা, ধর্মালোচনা এবং ধর্ম শ্রবণ করে বিশুদ্ধ জীবনযাপন করতে হয়।
- ২। বর্ষাবাসস্তুতকালে প্রতি পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে ভিক্ষুদের পাতিমোক্খ আবৃত্তি করতে হয়।
- ৩। বর্ষাবাসস্তুতকালে ভিক্ষুগণকে ছোট-বড় ভেদাভেদ ভূলে নিজের দোষত্বাটি স্মীকার করতে হয়। এজন্য জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে কৃত দোষের জন্য তাঁরা পরম্পরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কনিষ্ঠ ভিক্ষু বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর কাছে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষু কনিষ্ঠ ভিক্ষুর কাছে দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফলে অহংকার দূরীভূত হয়। পারম্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভঙ্গি, শাশ্বতা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়।
- ৪। বিহারাঙ্গান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়।



বর্ষাবাসস্তুতে সীমাগৃহে ভিক্ষুগণ

বর্ষাবাসস্তুতে গৃহীদের করণীয়

বর্ষাবাসস্তুত ভিক্ষুদের পালনীয় কর্ম হলো এ সময় গৃহীদের ও অনেক করণীয় রয়েছে। বর্ষাবাসস্তুতধারী ভিক্ষুদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করা গৃহীদের কর্তব্য। ভিক্ষুদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে

একত্রে চতুর্থত্যয় বলা হয়। বর্ষাবাস্ত্রতের সময় গৃহীরা ভিক্ষুদের চতুর্থত্যয় দান করেন। চতুর্থত্যয় হলো: অন্ন, বস্ত্র (চীবর), বাসস্থান ও চিকিৎসা। গৃহীরা নিজ নিজ গ্রামের বিহারে বর্ষাবাস উদ্যাপনের জন্য ভিক্ষুদের আমন্ত্রণ জানান। ভিক্ষু সম্মতি জ্ঞাপন করলে নির্দিষ্ট তিথিতে বর্ষাবাস্ত্রত শুরু হয়।

বর্ষাবাস্ত্রতের সময় প্রতিটি পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে গৃহী বৌদ্ধরা বিহারে গিয়ে উপোসথ গ্রহণ করেন। ভিক্ষুদের কাছ থেকে ধর্মকথা শ্রবণ করেন। এ সময় ধর্মসভারও আয়োজন করা হয়। পদ্ধিত ভিক্ষু এবং পদ্ধিত ব্যক্তিরা ধর্মালোচনা করেন। গৃহীরা ধর্মসভায় যোগদান করে ধর্মালোচনা শ্রবণ করেন। ধ্যান-সমাধি চর্চা করেন। প্রাণী হত্যা হতে বিরত থাকার অভ্যাস গড়ে তোলেন। কুশলকর্ম সম্পাদন করেন। এভাবে গৃহীরা বর্ষাবাস্ত্রতের সময় ধর্মসম্মত জীবনযাপন করে পরিশুদ্ধি লাভ করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বর্ষাবাস্ত্রত কালে ভিক্ষুগণ কী কী কারণে অন্যত্র রাত্রি যাপন করতে পারেন তার একটি তালিকা
প্রস্তুত কর (দলীয় কাজ)।
কী কী কারণে বর্ষাবাস্ত্রতের স্থান পরিবর্তন করা যায়?
বর্ষাবাস্ত্রতে গৃহীদের করণীয় বর্ণনা কর।

পাঠ : ২

উপোসথ

উপোসথ ভিক্ষু এবং গৃহী উভয়ের পালনীয় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। উপোসথের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। বৌদ্ধরা পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং অষ্টমী তিথিতে উপোসথ পালন করেন। ধর্মময় উৎকৃষ্ট জীবন গঠনের জন্য বুদ্ধ উপোসথের প্রবর্তন করেছিলেন। উপোসথ পালনে ধর্মানুভূতি জাহাত হয়। কায়-মন-বাক্য এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয় সংযত হয়। তাই সকলের উপোসথ পালন করা উচিত।

উপোসথের পটভূমি

একসময় বুদ্ধ রাজগৃহের গুধ্বকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। সে সময় অন্যান্য তীর্থিক সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকগণ চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং অষ্টমী তিথিতে সমবেত হয়ে ধর্মালোচনা করতেন। জনসাধারণ তাঁদের কাছে ধর্ম শ্রবণের জন্য উপস্থিত হতেন। তাঁদের শ্রদ্ধা ও সৎকার করতেন। ফলে তীর্থিক পরিব্রাজকগণ জনগণকে তাঁদের পক্ষভূত করে নিতেন। একদিন মগধরাজ বিষ্ণুর নির্জনে ধ্যানবিষ্ট থাকার সময় তাঁর মনে এরূপ চিন্তা উদিত হয়: ‘এখন অন্যান্য তীর্থিক পরিব্রাজকগণ চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং অষ্টমী তিথিতে সমবেত হয়ে ধর্মালোচনা করছেন। জনসাধারণ ধর্ম শ্রবণের নিমিত্ত তাঁদের নিকট উপস্থিত হচ্ছেন। তাঁদের শ্রদ্ধা ও সৎকার করছেন। ভিক্ষুগণও চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং অষ্টমী তিথিতে সমবেত হলে ভালো হয়।’ এভাবে তিনি ভিক্ষুদের ধর্ম-বিনয় পালনের সময় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার কথা ভাবলেন। অতঃপর তিনি বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে অভিবাদনপূর্বক বুদ্ধকে বিষয়টি উপস্থাপন করেন।

বুদ্ধ মগধরাজ বিষিসারের আবেদন গভীরভাবে উপলব্ধি করেন এবং তাঁকে ধর্মদেশনা করেন। ধর্মবাণী শ্রবণ করে রাজা বিষিসার মৈত্রীচিত্তে প্রাসাদে গমন করেন। তারপর ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করে চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং অষ্টমী তিথিতে সমবেত হয়ে উপোসথ পালন, উপোসথে ধর্মালোচনা ও পাতিমোক্ত আবৃত্তির নির্দেশ দেন। তখন থেকে উপোসথের প্রচলন শুরু হয়। বুদ্ধ অত্যন্ত পরিমিত আহার করতেন। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কখনো আতিশয্য ছিল না। তিনি ভিক্ষুসংঘকেও পরিমিত আহারের উপদেশ দিতেন। সূত্রপিটকের মজ্বিম নিকায়ের ‘কীটাগিরি’ সূত্রে দেখা যায় – বুদ্ধ তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ ! আমি রাতের আহার ছেড়ে দিয়েছি। তাতে আমার শরীরের অসুখ ও জড়তা কমে গেছে। শরীরের কর্ম শক্তি বেড়েছে। চিত্তে প্রশান্তভাব এসেছে। হে ভিক্ষুগণ ! তোমরাও এভাবে চলবে। তোমরা যদি রাতের আহার ছেড়ে দাও তাহলে তোমাদের শরীরে রোগ সমস্যা কম হবে। শরীরের জড়তা কমে যাবে। সুস্থ থাকবে এবং তোমাদের চিত্তে স্থিরতা আসবে।’

সেই সময় থেকে ভিক্ষুদের মধ্যে এক বেলা আহার করার নিয়ম প্রবর্তন হয়। তা গ্রহণ করতে হয় মধ্যাহ্নের মধ্যে। দুপুর বারোটার আগে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এ নিয়ম নিয়ত পালন করেন। ভিক্ষুদের অনুসরণ করে গৃহীরাও উপোসথ তিথিতে এ নিয়ম অনুশীলন করেন। উপোসথ দিনে গৃহীরা দুপুর বারোটার মধ্যে আহার শেষ করেন এবং পরদিন সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন না।

উপোসথ ও উপবাসের মধ্যে পার্থক্য

‘উপোসথ’ শব্দটি ‘উপবাস’ শব্দ থেকে উদ্ভৃত। বৌদ্ধরা পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং অষ্টমী তিথির উপোসথে উপবাসব্রত পালন করেন। প্রতিদিন তিনবেলা আহার মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাস। মাঝে মাঝে উপবাস করে শরীরে খাদ্যদ্রব্যের উপযোগিতা অনুভব করা যায়। এ ছাড়া এর মাধ্যমে দরিদ্র অভুক্ত মানুষের কষ্ট উপলব্ধি করা যায়। তাই অনেকের কাছে উপবাস উপোসথের প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়।

উপোসথতে বৌদ্ধরা উপবাস পালন করলেও বৌদ্ধধর্মে উপোসথ অর্থ কেবল উপবাস বা খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ হতে বিরত থাকা বোঝায় না। উপোসথের সাথে ধর্মানুশীলন, শীল পালন, ধ্যান-সমাধি চর্চা ও সংযত জীবনযাপনের বিষয়টিও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। উপোসথ পালনকারীদের বিনয় বিধান অনুসারে কিছু নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনে ব্রতী হতে হয়। কিন্তু কেবল উপবাসের ক্ষেত্রে এ বিধি পালনীয় নয়। যেমন, উপোসথ দিবসে বিহারে ভিক্ষুগণ পাতিমোক্ত আবৃত্তি, ধর্ম- দেশনা, ধর্মালোচনা এবং ধ্যান-সমাধি চর্চা করে দিন অতিবাহিত করেন। গৃহী বৌদ্ধরা উপোসথ দিবসে বিহারে গিয়ে নানারকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। সাধারণত গৃহী বৌদ্ধরা পঞ্চশীল পালন করেন। কিন্তু উপোসথ দিবসে তাঁরা অষ্টশীল গ্রহণ করে উপবাস পালন করেন। যাঁরা উপোসথ পালন করেন তাঁদের উপোসথিক বলা হয়। উপোসথিকরা ধর্ম শ্রবণ ও ধ্যান-সমাধি চর্চা করেন। সংযত জীবনযাপন করেন। অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকেন। শ্রদ্ধাচিত্তে দান প্রদান করেন। অতএব বৌদ্ধদের কাছে উপোসথ শুধু উপবাস থাকা নয়। শীল পালনের ব্রত গ্রহণ করে

চিন্ত শুন্ধ করাই আসল লক্ষ্য। চিন্তকে শুন্ধ করতে পারলে ত্বকাকে ক্ষয় করা সম্ভব। ত্বকা ক্ষয় হলে লোভ-হেষ-মোহের উচ্ছেদ হয়। এতে দুঃখমুক্তি সম্ভব হয়। দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করাই মূলত বৌদ্ধদের জীবনের প্রম লক্ষ্য। তাই উপোসথ এবং সাধারণ উপবাসের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।



বৌদ্ধ বিহারে ভিক্ষু গৃহীদের ধর্মোপদেশ দান করছেন

উপোসথ পালনের নিয়মাবলি

উপোসথ পালনকারী গৃহীদের অনেক নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। উপোসথ গ্রহণেছুক উপাসক-উপাসিকাগণ উপোসথ দিবসে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠবেন। প্রাতঃকৃত্যসহ স্নানাদি শেষ করে পরিকার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধানপূর্বক পূজা ও দানের উপকরণ নিয়ে পরিত্র মনে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের গুণরাশি স্মরণ করতে করতে সংযতভাবে বিহারে ঘাওয়া সমীচীন। বিহারে পৌছে পূজা ও বন্দনার কাজ সম্পাদনের পর ভিক্ষুর কাছ থেকে উপোসথ শীল গ্রহণ করবেন। কোনো কারণে বিহারে উপস্থিত হতে না পারলে গৃহে উপোসথ শীল গ্রহণ করা যায়। উপোসথ শীল গ্রহণের পর সুসংযতভাবে জপমালায়, ধর্মগ্রন্থে, ধর্মালোচনায় বা ধ্যানে চিন্তকে নিবিঞ্চ রাখা কর্তব্য। লোভ, হেষ, মোহ, বিলাসিতা প্রভৃতি ত্যাগ করে প্রতিটি যুক্ত ধর্ম ও কুশল চিন্তা করে অতিবাহিত করা উচিত। চলাফেরায়, অবলোকনে এবং ভাষণে সংযতভাব বজায় রাখতে হবে। প্রাণিহত্যা, চুরি বা অদস্ত বস্তু গ্রহণ, অব্রহাচর্য আচরণ, মিথ্যা ভাষণ, নেশাদ্রব্য গ্রহণ, বিকাল ভোজন, নৃত্য-গীত-বাদ্যে অমত্ততা দর্শন এবং অলঙ্কার ও সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার, উচ্চশব্দ্য ও মহাশয়ায় শয়ন প্রভৃতি হতে বিরত থাকতে হবে। সকল প্রাণীর প্রতি দয়াশীল আচরণ করতে হবে। অতঃপর উপোসথিকের এবৃপ্ত অধিষ্ঠান করা উচিত।

‘আমি কারও অনিষ্ট কামনা করব না। কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেব না। কষ্ট প্রদানের কারণও হব না। নিজেও অনাচার, অত্যাচার করব না, এর কারণও হব না। পরের ধনে লোভ করব না। কারও লাভ-সংকারের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হব না, বরং সাধুবাদের সাথে তা অনুমোদন করব। কোনো প্রকার মিথ্যা বিষয়ের পরিকল্পনা করব না। গৃহকর্ম বিষয়ে আলোচনায় রত হব না। গৃহীজনোচিত আচার-আচরণ থেকে মুক্ত থাকব। শুধু ধর্মশ্রবণ, ধর্মালোচনা ও ধর্মচিন্তা করে দিন অতিবাহিত করব।’

উপোসথের প্রকারভেদ

অনুসরণ রীতি ও সময় অনুসারে উপোসথ পাঁচ প্রকার। যথা : ১. প্রতিজাগর উপোসথ, ২. গোপালক উপোসথ, ৩. নির্গুণ্য উপোসথ, ৪. আর্য উপোসথ এবং ৫. প্রতিহার্য উপোসথ।

১. প্রতিজাগর উপোসথ : সার্বক্ষণিক সজাগ থেকে অত্যন্ত, সচেতন ও যত্নের সঙ্গে অক্ষশীল পালন করার নাম প্রতিজাগর উপোসথ। উপোসথে উপোসথিককে রাতে ঘুমের সময় ছাড়া অন্য সময় প্রতিটি নিয়ম যথাযথভাবে পালন করতে হয়। এরূপ শীল গ্রহণকারীগণ উপোসথের দিন ছাড়া অন্যান্য দিনেও উপোসথ পালন করেন।

২. গোপালক উপোসথ : যে উপোসথ গ্রহণকারী ধর্মচিন্তা বাদ দিয়ে খাদ্য, ভোজ্য, অভাব অন্টন বিষয়ে চিন্তা করে তাকে গোপালক উপোসথ গ্রহণকারী বলে। গরু পরিচর্যাকারী রাখাল যেমন পরের গরু নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকে, তেমনি এরূপ উপোসথ গ্রহণকারীগণও করণীয় কর্ম না করে অসার ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে আলাপ করে সময় নষ্ট করে। এটি অত্যন্ত নিম্নস্তরের উপোসথ।

৩. নির্গুণ্য উপোসথ : নির্গুণ্য অর্থ গ্রন্থহীন অর্থ্যাত নগ্ন। গৌতম বুদ্ধের সময় একরকম নগ্ন সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁরা যে উপোসথ গ্রহণ করতেন তাঁর নাম নির্গুণ্য উপোসথ। তাঁরা স্বাভাবিক খাবার গ্রহণ করতেন। প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকলেও নিজেদের প্রয়োজনে তাঁরা প্রাণিহত্যা করতেন। এতে কোনো পাপ হয় না বলে তাঁরা অভিযত পোষণ করতেন। এরূপ আস্ত্রচিত্তে উপোসথ পালনকে নির্গুণ্য উপোসথ বলা হয়।

৪. আর্য উপোসথ : আর্য শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। এই উপোসথই শ্রেষ্ঠ উপোসথ। বুদ্ধ এই মহান উপোসথ ব্রতই প্রবর্তন করেছিলেন। বুদ্ধের শ্রাবকগণ এই উপোসথ পালন করতেন। আর্য উপোসথ গ্রহণকারীগণ উপোসথ গ্রহণ করে জাগতিক সুখ ভোগের চিন্তা ত্যাগ করেন। তাঁরা বুদ্ধানুস্মতি, ধর্মানুস্মতি, শীলানুস্মতি ও মৈত্রী ভাবনায় রত থেকে উপোসথব্রত পালন করেন। সকলের আর্য উপোসথ গ্রহণ ও পালন করা উচিত। অর্থাত অক্ত্রিমভাবে সশ্রদ্ধচিত্তে সকল নিয়ম অনুসরণ করে উপোসথ পালনই আর্য উপোসথ।

৫. প্রতিহার্য উপোসথ : বছরের কিছু সময় নির্দিষ্ট করে নিয়মিত উপোসথ পালনকে প্রতিহার্য উপোসথ বলে। এরূপ উপোসথ বিভিন্ন রকম হয়। ১. আশাটী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাস প্রতিদিন উপোসথ পালন করাকে বলে উৎকৃষ্ট প্রতিহার্য উপোসথ। ২. আশ্বিনী পূর্ণিমা থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত কিংবা ৩. আশ্বিনী পূর্ণিমা থেকে পরবর্তী পনের দিনব্যাপী প্রতিদিন উপোসথ পালন

করাকে হীন প্রতিহার্ষ উপোসথ বলে। এই তিনি উপোসথের যেকোনো এক রকম উপোসথ পালন করা খুব পুণ্যের। এগুলোকে প্রতিহার্ষ উপোসথ বলে।



গৃহীরা উপোসথ গ্রহণ করে বিহারে বসে ধ্যান-সমাধি চর্চা করছেন।

উপোসথ পালনের সুফল

ত্রিপিটকের বহু স্থানে উপোসথত্বত পালনের সুফল বর্ণিত আছে। তাতে বলা হয়েছে, চন্দ্ৰ-সূর্যের কিৱণ
পৃথিবীৰ অন্ধকাৱ দূৰীভূত কৱে। এজন্য চন্দ্ৰ-সূৰ্যকে প্ৰাণী জগতেৰ জীৱন বলা হয়। কিন্তু উপোসথ শীলেৰ
গুণেৰ সঙ্গে তুলনা কৱলে চন্দ্ৰ-সূৰ্যেৰ গুণ অতি সামান্য। পৃথিবী ও সাগৱেৰ সমস্ত সম্পদ, হীৱা ও
মণিৰত্ন অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীলেৰ তুলনায় তুচ্ছ। এমনকি দেবতাদেৱ ঐশ্বৰও এৱ কাছে নগণ্য। স্বৰ্গীয়
আনন্দ উৎকৃষ্টতাৰ হলেও ক্ষণম্যায়ী কিন্তু উপোসথ শীলেৰ ধাৰা অৰ্জিত আনন্দ অবিনশ্বৰ ও চিৱ
শান্তিদায়ক। উপোসথ শীলেৰ অনাবিল শান্তিময়ী দীপি চন্দ্ৰ, সূৰ্য, হীৱা-মণি-মুক্তাৰ উজ্জ্বল প্ৰভা, দেবতাৰ
দিব্যজ্যোতি সবকিছুকেই পৱাভূত কৱে। ফুলেৰ সুগংথ বাতাসেৰ অনুকূলে প্ৰবাহিত হলেও উপোসথ শীলেৰ
গুণ সৌৱত বাতাসেৰ অনুকূল-প্রতিকূল এবং চতুর্দিকে প্ৰবাহিত হয়।

একসময় তাৰতিংস সৰ্বেৰ রাজা দেৱৱাজ ইন্দ্ৰ অন্যান্য দেবতাদেৱ উদ্দেশ্য কৱে বলেছিলেন, ‘হে দেবতাগণ! তোমোৱা যদি আমাৰ মতো ইন্দ্ৰ হতে ইচ্ছা কৱ তাহলে পূৰ্ণিমা, অষ্টমী ও অমাৰস্যায় আট অঞ্চলৰ উপোসথ
শীল পালন কৱ।

আর এর চেয়েও যারা পুণ্যকামী তারা প্রতিজাগর, প্রতিহার্য উপোসথ পালন কর। এভাবে তোমরা নিজেকে সম্যক পথে পরিচালিত কর।'

দেবরাজ ইন্দ্র আরও বলেছেন; 'যে গৃহী নিজের স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করেন, যিনি পুণ্যবান ও শীলবান এবং ত্রিত্বের উপাসক, তাঁকে আমি নমস্কার করি, আমরা জানি দেবতারা উচ্চ মার্গের সত্ত্বা হলেও সম্পূর্ণ মুক্ত নন। তাঁদের মধ্যে রাগ, দ্বেষ ও মোহ আছে। তবে তাঁরা দিব্য চোখে মানুষের পুণ্য ও অপুণ্য দেখতে পান। মানুষের মধ্যে যারা সত্ত্বাবে জীবনযাপন করেন, বড়দের ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, মাতাপিতার উপযুক্ত ভরণপোষণ করেন, উপযুক্ত সময়ে উপোসথ পালন করেন তাঁদের উন্নতিতে দেবতারা প্রশংসা করেন। স্বয়ং ইন্দ্র তাঁদের শ্রদ্ধা করেন।'

মহাকারুণিক বুদ্ধ প্রবর্তিত মহামূল্যবান আট অঙ্গের উপোসথ শীল মহাফলদায়ী। তাই উপোসথ শীল আমাদের সঠিকভাবে পালন করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

গৃহী উপোসথিকের করণীয়সমূহ চিহ্নিত কর।
উপোসথের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

পাঠ : ৩

কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান

দান অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে কঠিন চীবর দান অন্যতম। প্রতিটি বৌদ্ধ দেশে এ দান কার্য যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে সম্পাদিত হয়। বিধিবন্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও আয়োজনের ব্যাপকতায় এটি উৎসবের আকার ধারণ করে। তাই কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানকে দানোত্তম কঠিন চীবর দানোৎসব বলা হয়। বাংলাদেশের বৌদ্ধরা প্রতিবছর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও নির্মল আনন্দে কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান উদ্যাপন করে।

কঠিন চীবর দানের পটভূমি

একসময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবণ্তীর জেতবনে শ্রেষ্ঠী অনাথপিডিক নির্মিত বিহারে বাস করছিলেন। সে সময় পাঠ্যবাসী ত্রিশজন ভিক্ষু বুদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ করার মনস্থ করেন। তাঁরা সবাই ছিলেন ধূতাঙ্গাধারী। ধূতাঙ্গ হলো কঠিন কৃচ্ছ সাধন। বর্ষাবাসব্রত গ্রহণের আগে বুদ্ধকে দর্শন করার জন্য তাঁদের মনে বাসনা জাগ্রত হয়। মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য তাঁরা পাঠ্য থেকে শ্রাবণ্তী অভিমুখে যাত্রা করেন। অনেক দূর গিয়ে তাঁরা বুঝতে পারলেন, বর্ষাবাসের আগে শ্রাবণ্তী পৌছার সম্ভাবনা নেই। তাই মাঝপথে সাকেত নামক স্থানে তাঁরা বর্ষাবাসব্রত আরম্ভ করেন। সেখানে তাঁরা যথারীতি তিন মাস বর্ষাবাসব্রত সম্পন্ন করেন। তথাগতের সাক্ষাৎ লাভের জন্য তাঁরা খুব উদগীব ছিলেন। তাই প্রবারণার পরদিনই তাঁরা শ্রাবণ্তীতে পৌছালেন। বর্ষা খতুর বৃক্ষের ধারা তখনও শেষ হয়নি। ভেজা চীবর গায়ে ভিক্ষুরা বুদ্ধের কাছে পৌছলেন। বন্দনা জ্ঞাপন করে বুদ্ধের পাশে সকলেই আসন গ্রহণ করেন। বুদ্ধ তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা উভয়ে বলেন, 'আমরা বর্ষাবাস আসন্ন দেখে সাকেত নগরে অবস্থান করেছিলাম। অথচ সাকেত থেকে শ্রাবণ্তীর দূরত্ব মাত্র ছয় যোজন। তবুও আপনার দর্শনলাভে বিষ্ণিত হয়েছি। খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে বর্ষাবাসব্রত

আরম্ভ করেছিলাম। বর্ষাবাসব্রতের তিন মাস শেষ হলো। প্রবারণা সম্পন্ন করে ভেজা কাপড়ে কর্দমাক্ত
পথ অতিক্রম করে এখানে এসেছি। খুব ক্লান্তবোধ করছি কিন্তু আপনার সান্নিধ্য পেয়ে এখন আনন্দবোধ করছি।
তখন বুদ্ধ এ প্রসঙ্গে ভিক্ষুদের আহ্বান করে ধর্ম-দেশনা করেন। অতঃপর তিনি ভিক্ষুদের নির্দেশ দিলেন,
'ভিক্ষুগণ! এখন থেকে তোমরা কঠিন চীবরে আবৃত হবে। বর্ষাবাসব্রত সমাপ্তকারী ভিক্ষুদের জন্য এটা
পরম পুণ্যের কাজ।' তখন থেকে ভিক্ষুদের মধ্যে কঠিন চীবর পরিধান প্রথার সূচনা হয়।

কঠিন চীবর দানের নিয়মাবলি

এখন আমরা কঠিন চীবর দানের নিয়মাবলি জানব। অন্যান্য দান বছরের যেকোনো সময় করা যায়। কিন্তু
কঠিন চীবর দান বছরে একবার মাত্র করা হয়। তাও আবার একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। আশ্বিনী পূর্ণিমার
পরদিন থেকে কার্তিকী পূর্ণিমার পূর্বদিন পর্যন্ত এই দান অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয়। একটি বিহারে একবার
মাত্র কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান করা যায়। যে বিহারে ভিক্ষু বর্ষাবাসব্রত পালন করেন না সে বিহারে কঠিন
চীবর দান উদযাপিত হয় না।

'কঠিন' ও 'চীবর' এই দুটি শব্দের পৃথক গুরুত্ব রয়েছে। এখানে চীবর হলো ভিক্ষুদের পরিধেয় কাপড়।
ভিক্ষুসংঘ 'কম্ববাচা' পাঠের মাধ্যমে ধর্মীয় রীতিতে চীবরকে কঠিন চীবরে পরিণত করেন। নির্দিষ্ট
নীতিমালা অনুসরণ করে চীবরকে পরিশুদ্ধ করতে হয় বলে একে কঠিন চীবর বলা হয়। সেজন্য উপাসক-
উপাসিকারা চীবর দান করলেও তা কঠিনে পরিণত হয় না। কম্ববাচা পাঠ শেষে কঠিন চীবর বিহারাধ্যক্ষ
ভিক্ষুকে প্রদান করা হয়। কঠিন চীবর লাভকারী ভিক্ষুকে কমপক্ষে ফাল্বুনী পূর্ণিমা পর্যন্ত কঠিন চীবর নিজের
পাশে রাখতে হয়। কোথাও গেলে কঠিন চীবর সঙ্গে নিতে হয়। কঠিন চীবর লাভকারী ভিক্ষু পাঁচটি পাপ
থেকে রক্ষা পায় এবং পাঁচটি পুণ্যফল লাভ করেন বলে শান্তে উল্লেখ আছে। অন্যান্য দানে এরূপ দেখা
যায় না। অন্যান্য দান হতে কঠিন চীবর দানের পদ্ধতিও ভিন্ন।

কঠিন চীবর দানের পদ্ধতি

যে দিন কঠিন চীবরদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেদিনের সূর্য উদয় থেকে পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্ব
সময় পর্যন্ত কঠিন চীবরদান দেওয়া যায়। এ সময়ের মধ্যে কাপড় বোনা, সেলাই, রং প্রভৃতি কাজ একই
দিনে করতে পারলে ভালো। এ নিয়মে তৈরিকৃত চীবর দান করলে অধিকতর কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক
পুণ্য লাভ হয়। বাজার থেকে ক্রয় করা কাপড় সেলাই করেও দান দেওয়ার বিধান রয়েছে। তবে এরূপ
দানের পূর্বে শীলামুশূতি ও মৈত্রী ভাবনায় রত থাকা ভালো। কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর উপস্থিতিতে এ
দানকার্য সম্পন্ন করতে হয়।

কঠিন চীবরদান উপলক্ষে সর্বত্র বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নানা কর্মসূচিতে এ দানানুষ্ঠান
উৎসবে রূপ নেয়। তবে এ অনুষ্ঠানে শুদ্ধা, ভক্তি ও সংযম চর্চা অপরিহার্য। প্রথমে ত্রিশরণ গ্রহণ করে
পঞ্চশীল নিতে হয়। তারপর ধর্ম দেশনা হয়। পরে নিচের পালি উৎসর্গ গাথাটি উচ্চারণ করে উপস্থিত
ভিক্ষুসংঘকে চীবর দান করতে হয়।

ইমৎ কঠিন চীবরং ভিক্ষুসংস্ক দেম, কঠিন অথরিতুং।

দুতিয়ম্পি ইমৎ কঠিন চীবরং ভিক্ষুসংস্ক দেম, কঠিনং অথরিতুং।

ততিয়ম্পি ইমৎ কঠিন চীবরং ভিক্ষুসংস্ক দেম, কঠিন অথরিতুং।

বাংলা অনুবাদ :

কঠিনরূপে (নিয়ম-নীতির ধারায়) অর্থপূর্ণ পরিধেয় করার জন্য এ কঠিন চীবরখানি ভিক্ষুসংঘকে দান করছি।

দ্বিতীয়বারও কঠিনরূপে অর্থপূর্ণ পরিধেয় করার জন্য এ কঠিন চীবরখানি ভিক্ষুসংঘকে দান করছি।

তৃতীয়বারও কঠিনরূপে অর্থপূর্ণ পরিধেয় করার জন্য এ কঠিন চীবরখানি ভিক্ষুসংঘকে দান করছি।

বৌদ্ধধর্মীয় সকল বিষয়ে এভাবে একই কথা তিনবার উচ্চারণের বিধান রয়েছে। এতে মনের সংশয় দূর হয়। করণীয় বিষয়ে একান্তভা বাঢ়ে। অর্ধাদ দান কাজে শ্রমা ভক্তি ও মনসংযোগ সুদৃঢ় করার জন্য এক কথাকে তিনবার উচ্চারণ করতে হয়। উৎসর্গ গাথা পাঠ করার পর ভিক্ষুসংঘের হাতে কঠিন চীবরখানি তুলে দিতে হয়।

ভিক্ষুসংঘ আবার সে চীবর বিনয়সম্ভত ও অর্থপূর্ণ করার জন্য সীমাবদ্ধে নিয়ে ধান। সেখানে অ্রিপিটক থেকে ‘কষবাচ’ পাঠ করে সংস্কৰণ অনুমোদনক্রমে বিহারস্থ উপযুক্ত ভিক্ষুকে দেওয়া হয়। তিনি কঠিন চীবরের পঞ্চফল লাভ করেন। তবে বিনয়ের নিয়ম অনুসারে বিহারের অন্যান্য ভিক্ষুকেও কঠিন চীবর অনুমোদন করতে হয়।



উপাসক-উপাসিকাগণ কঠিন চীবর দান করছেন

আনুষ্ঠানিকতা

শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের দেশে বিপুল উৎসাহ উদ্বৃত্তির মধ্যে কঠিন চীবর দান উদ্যাপন করা হয়। উৎসবের পূর্বদিন বিহারকে অপূর্ববৃপ্তে সাজানো হয়। তোরণসজ্জিত করা হয়। প্রত্যেক গৃহে অতিথি আতীয়-স্বজনের সমাগম হয়। বিভিন্ন বিহার হতে ভিক্ষুসংঘের আগমন হয়। পুরো এলাকায় উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়। এসময় বিহারের বাইরে নানা দ্রব্যের পসরা সাজিয়ে মেলা বসে। এ মেলাতে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করে।

অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মর্যাদার সাথে জাতীয় ও ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বৌদ্ধ নরনারী ও শিশু-কিশোর যুবক সকলে নানারঙ্গের পোশাক পরিধান করে নানারকম দানীয় দ্রব্য নিয়ে বিহারে আসে। এতে দূর-দূরাঞ্চ থেকেও অনেক ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকা যোগদান করেন। এ উপলক্ষে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘক্ষণ ধর্মালোচনা চলে। শেষে ধর্মীয় কীর্তন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানে বিহার প্রাঙ্গণ মুখরিত থাকে।

কঠিন চীবর দানের সুফল

ভগবান বুদ্ধ পাঁচশ অর্হৎ শিষ্যের উদ্দেশে কঠিন চীবর দানের সুফল বর্ণনা করেছিলেন। স্থান ছিল হিমালয়ের অনবতঙ্গ হ্রদ। সেখানে তিনি শিষ্যগণ পরিবৃত হয়ে উপবেশন করেন। মনে হয়েছিল যেন দেবসভা। প্রস্ফুটিত পঞ্চের উপর তাঁর আসন দেবলোকের সৌন্দর্যকে হার মানায়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে নাগিত স্থবির কঠিন চীবর দান করে জন্মজন্মান্তরে যে দানফল ভোগ করেছিলেন তা বর্ণনা করেন। নাগিত স্থবির কঠিন চীবর দানের সুফল সম্পর্কে বলেন-

১. ত্রিশ কল্প পূর্বে শিথী বুদ্ধের সময় আমি মনুষ্যলোকে জন্মাহণ করেছিলাম। তখন আমি ভিক্ষুসংঘকে কঠিন চীবর দান করি। সেই দানের ফলে এযাবৎ আমি কোনো দুর্গতি ভোগ করিনি।
২. আমি আঠার কল্পকাল দেবলোকে দিব্যসুখ ভোগ করেছি। চৌত্রিশবার দেবরাজ ইন্দ্র হয়েছি।
৩. সহস্রবার দেবরাজে ব্রহ্ম হয়ে জন্মাহণ করেছি। ব্রহ্মালোক হতে চুত্যত হলে মনুষ্যলোকে উচ্চবংশে মহাধনীর গৃহে জন্মাহণ করেছি।
৪. রাজচক্রবর্তী-সুখ ভোগ করেছি। যেখানে জন্মেছি সেখানেই সম্পদ লাভ করেছি। কোনোদিন অভাব-অন্টন ভোগ করিনি।

নাগিত স্থবিরের পর বুদ্ধ কঠিন চীবর দানের সুফল বর্ণনা করেন, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. কোনো দাতা অন্যান্য দানীয় বস্তু একশত বছর দান করলেও তার ফল একখানি কঠিন চীবর দানের ঘোল ভাগের একভাগও হয় না।

২. কোনো দাতা শতবর্ষ পর্যন্ত পাত্র-চীবরাদি ভিক্ষুদের ব্যবহার্য অষ্টপরিঙ্গার দান করে, তার ফলও কঠিন চীবর দানের দ্বারা অর্জিত পুণ্যের ষোল ভাগের একভাগ হয় না।
৩. কোনো দায়ক সুমেরু পর্বততুল্য স্তুপ করে ভিক্ষুসংঘকে ত্রিচীবর দান করলেও তার ফল কঠিন চীবর দানের দ্বারা অর্জিত পুণ্যের ষোল ভাগের একভাগ হয় না।
৪. কোনো দাতা স্বর্গ-রোপ্য খচিত চুরাশি হাজার বিহার ভিক্ষুসংঘকে দান করলেও তার ফল কঠিন চীবর দানের দ্বারা অর্জিত পুণ্যের ষোল ভাগের একভাগ হয় না।
৫. সর্বজ্ঞবুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ এবং বুদ্ধশিষ্যগণ সকলেই কঠিন চীবর দানের ফলেই অমৃতপদ লাভ করেছেন।
৬. কঠিন চীবর দানের ফলে সকল প্রকার ধনসম্পদ, সুকৃতি এবং স্বর্গ লাভ হয়।
কঠিন চীবর দানের ফল জন্ম-জন্মান্তরে প্রবাহিত হয়। তাই শুদ্ধাচ্ছিতে জীবনে একবার হলেও কঠিন চীবর দান করা সকলের উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

কঠিন চীবর দানের পটভূমি বর্ণনা কর।
কঠিন চীবর দানের বুদ্ধ বর্ণিত পাঁচটি সুফল লেখ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. বর্ষাবাস বুদ্ধ প্রবর্তিত অংশ।
২. অনুসরণ রীতি ও সময় অনুসারে পাঁচ প্রকার।
৩. ভিক্ষুদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে একত্রেবলা হয়।
৪. কঠিন চীবর লাভকারী ভিক্ষুপাপ থেকে রক্ষা পায়।
৫. কঠিন চীবর দানের ফলে সকল প্রকার সুকৃতি এবংলাভ হয়।

মিলকরণ

বাম	ডান
১. বর্ষাবাস বৌদ্ধদের একটি গুরুত্বপূর্ণ	পঞ্চশীল পালন করেন
২. বর্ষাবাসব্রতকে ভিক্ষুদের আআশুক্ষির	ত্রুট্যার ক্ষয় হয়
৩. গৃহী বৌদ্ধরা	শ্রেষ্ঠ
৪. চিন্তকে শুধু করতে পারলে	ধর্মীয় অনুষ্ঠান
৫. আর্য শব্দের অর্থ	অধিষ্ঠান বলে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বর্ষাবাস্ত্রত কোথায়, কত মাস পালন করতে হয়?
২. কোন কোন তিথিতে ভিক্ষুসংঘ পাতিমোক্ষ আবৃত্তি করেন?
৩. ‘উপোসথ’ বলতে কী বোঝায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বর্ষাবাস্ত্রত কখন, কেন পালন করা হয় লেখ।
২. কী উদ্দেশ্যে বুদ্ধ বর্ষাবাস্ত্রত পালনের বিধান দিয়েছিলেন বর্ণনা কর।
৩. বর্ষাবাস্ত্রতে ভিক্ষু ও গৃহীদের করণীয়সমূহ আলোচনা কর।
৪. উপবাস ও উপোসথের পার্থক্যসমূহ নির্দেশ কর।
৫. কঠিন চীবর দান কখন, কোথায় ও কীভাবে করা হয় বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উপোসথ কারা পালন করতে পারেন ?

ক. ভিক্ষু	খ. গৃহী
গ. সন্ন্যাসী	ঘ. ভিক্ষু ও গৃহী
২. ভগবান বুদ্ধ কতজন ভিক্ষুকে কঠিন চীবর দানের ফল বর্ণনা করেন ?

ক. ৩০০	খ. ৪০০
গ. ৫০০	ঘ. ৬০০

নিচের উক্তিগুটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও -

সমীর বড়ুয়া আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত শীল পালন করেন। বিহারে অনুষ্ঠিতব্য দানোৎসবে তিনি চীবর দান করার সুযোগ পান।

৩. সমীর বড়ুয়া কোন অনুষ্ঠানে চীবর দান করলেন?

ক. সংঘদান	খ. অষ্টপরিক্ষার দান
গ. কঠিন চীবর দান	ঘ. পুগুগলিক দান।
৪. উক্ত দানের ফলে সমীর বড়ুয়া লাভ করতে পারে?

ক. স্বর্গসুখ	খ. ধনী পরিবারে জন্ম
গ. রাজচক্রবর্তী সুখ	ঘ. দিব্যসুখ।

সূজনশীল প্রশ্ন

১. বোধিমিত্র ভিক্ষু বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন এলাকায় সফর শুরু করেন। একপর্যায়ে বর্ষাবাদল শুরু হলে, তিনি ধর্মপাল বিহারে গিয়ে পৌছলেন। সেখানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবস্থান করে ধর্মীয় আলোচনা, ধ্যান-সাধনা ও বিদ্যাচর্চা করে সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। কয়েকদিন যাওয়ার পর পাশের গ্রামের একটি বিহারের তাঁর গুরু ভন্তে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে সেবায়ত্ত করার জন্য বোধিমিত্র ভিক্ষু ধর্মপাল বিহার ত্যাগ করলেন এবং ভন্তেকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন। চার দিন পর গুরু ভন্তে সুস্থ হয়ে উঠলে তিনি আবার ধর্মপাল বিহারে ফিরে এসে ধ্যান-সাধনায় নিয়োজিত হলেন। কিন্তু এভাবে বোধিমিত্র ভিক্ষুর বিহার ত্যাগ করাকে অনেকে পছন্দ করলেন না।
 - ক. কয় মাস ধরে বর্ষাবাস পালন করা হয় ?
 - খ. ভিক্ষুরা বর্ষাবাস পালন করেন কেন ?
 - গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি বৌদ্ধধর্মের কোন আচার অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ? ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. বোধিমিত্র ভিক্ষুর বিহার ত্যাগ করে হাসপাতালে রাত্যাপন ঘটনাটি বর্ষাবাস ব্রত বিধানের লক্ষণ'- বক্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।
২. সুমনা ও প্রীতি চাকমা দুই বোন। বর্ষাবাসব্রতকালীন সময়ে তারা বিহারে গিয়ে উপোসথ গ্রহণ করে। সুমনা চাকমা ঐ সময়ে ভিক্ষুকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করে এবং সারাদিন বুদ্ধ, ধর্ম, শীলানুস্মতি ও মৈত্রী ভাবনায় রত থাকে। অপরদিকে প্রীতি চাকমা উপোসথ গ্রহণ করলেও সুমনা চাকমার মতো ধ্যানচর্চা করে না। সে ধর্ম চিন্তা বাদ দিয়ে ভোগবিলাস ও পরিবারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে চিন্তা করে।
 - ক. ভিক্ষুদের জ্যেষ্ঠতা কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?
 - খ. বৌদ্ধধর্মে উপোসথের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
 - গ. সুমনা চাকমার আচরণটি উপোসথের সাথে সংগতিপূর্ণ-উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।
 - ঘ. প্রীতি চাকমার আচরণটি গোপালক উপোসথের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ-তুমি কি তার সঙ্গে একমত? মতামত দাও।

অষ্টম অধ্যায়

চরিতমালা

পৃথিবীতে অনেক জ্ঞানী ও গুণী মানুষের জন্ম হয়েছে। মানুষের কল্যাণে তাঁরা অনেক মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছেন। কর্মগুণে তাঁরা পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন। তাঁদের জীবনী পাঠ করে মানুষ নৈতিক জীবনযাপন এবং কুশল ও মহৎ কর্ম সম্পাদনে উদ্বৃদ্ধ হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে এরূপ অনেক ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, শ্রেষ্ঠী এবং উপাসক-উপাসিকার উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা কর্মগুণে বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ভিক্ষুদের খের বা স্থবিরও বলা হয়। ভিক্ষুণীদের থেরী বলা হয়। এ অধ্যায়ে আমরা কয়েকজন বৌদ্ধ থের-থেরী এবং বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবন চরিত পাঠ করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- * থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবন কাহিনি বর্ণনা করতে পারব।
- * থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবন কাহিনির ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ : ১

মহাকশ্যপ থের

মহাকশ্যপ ছিলেন বুদ্ধের প্রথম মহাশ্রাবক। বহু জন্মের পুণ্যফলে একসময়ে তিনি ব্রহ্মালোকে জন্মগ্রহণ করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধ রাজ্যের অন্তর্গত মহাতীর্থ নামক এক ব্রাহ্মণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল কপিল ব্রাহ্মণ। তাঁর গৃহী নাম ছিল পিপ্পলী মানব। ক্রমে পিপ্পলী মানব বড় হন। বড় হয়ে বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল ভদ্রা কপিলানি। তিনি ছিলেন মন্দরাজ্যের সাগল নগরে কোশীয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণের কন্যা। তিনি খুবই সুন্দরী ছিলেন। জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধনের প্রভাবে তাঁদের উভয়ের বিয়ে হয়। তাঁরা খুব ধার্মিক ছিলেন। সংসারধর্ম পালন করলেও তাঁরা ব্রহ্মচর্য জীবনযাপন করতেন। ব্রহ্মালোক থেকে যাঁরা পৃথিবীতে জন্ম নেন সংসারধর্মে তাঁদের আসন্তি থাকে না। পিপ্পলী মানব ও ভদ্রা কপিলানিরও তাই হলো। পিতার মৃত্যুর পর পিপ্পলী মানব ও ভদ্রা কপিলানি বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু ধন-সম্পদের প্রতি তাঁদের কোনো আকর্ষণ ছিল না। পিপ্পলী মানব গৃহত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি সংকল্পের কথা স্ত্রী ভদ্রা কপিলানিকে জানান। স্বামীর সংকল্পের কথা শুনে ভদ্রা কপিলানিও গৃহত্যাগের সংকল্প করেন। সমস্ত সম্পত্তি দান করে তাঁরা গৃহত্যাগের প্রস্তুতি নেন। তখন স্বামী বললেন, আমাদের একসঙ্গে গৃহত্যাগ করা উচিত হবে না। লোকে ভাববে, গৃহত্যাগ করা সন্ত্বে স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে বাস করছে। এ রকম ভাবলে লোকের পাপ হবে। তখন কপিলানি বললেন, আপনার কথাই সত্য। আমরা একপথে যাব না। আপনি ডান দিকে যান, আমি বাম দিকে যাব। এই বলে তিনি স্বামীকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করেন এবং বাম দিকে যাত্রা করেন। পিপ্পলী মানব ডান দিকে যাত্রা করেন। ঠিক সেই মুহূর্তে পৃথিবীতে ভূমিকম্প এবং আকাশে তয়ানক শব্দ হয়।

গৌতম বুদ্ধ তখন বেগুবনের মূলগন্ধ কুটিরে অবস্থান করছিলেন। বুদ্ধ দিব্যজ্ঞানে বুঝতে পারলেন, পরম ব্রহ্মচর্যধারী শ্঵ামী-স্ত্রীর বিছেদ ও কঠিন ত্যাগের প্রকাশ এবং গুণপ্রভাবই হঠাতে ভূমিকম্প ও ভয়ানক শব্দ হওয়ার কারণ। তিনি আরও জানতে পারলেন তাঁরা উভয়েই বুদ্ধের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করেছেন। তখন বুদ্ধ কাউকে কিছু না বলে কুটিরের বাইরে এলেন। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে রাজগৃহ ও নালদার মধ্যবর্তী এক বিরাট বটবৃক্ষমূলে এসে পঞ্চাসনে বসলেন। তখন বটবৃক্ষের চারদিক দিব্যজ্যোতিতে আলোকিত হয়ে উঠল। পিপুলী মানব পথ চলতে চলতে সেখানে উপস্থিত হন। দূর থেকে বুদ্ধকে দেখেই ভগ্নিতে তাঁর চিন্তা আপ্নুত হয়ে ওঠে। তিনি বুদ্ধের সামনে গিয়ে বন্দনা করে বললেন : ভন্তে ভগবান, আপনিই আমার শাস্তা, আমি আপনারই শিষ্য।

বুদ্ধ তখন পিপুলী মানবের গুণের প্রশংসা করলেন। তারপর তাঁকে ত্রিশরণ গ্রহণ দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করেন। ভিক্ষু হওয়ার পর তাঁর নাম রাখা হয় মহাকশ্যপ। দীক্ষার পর মহাকশ্যপকে সঙ্গে করে বুদ্ধ বেগুবনের পথে যাত্রা করেন। কিছুদূর আসার পর বুদ্ধ এক বৃক্ষের নিচে বসতে ইচ্ছা করলেন। মহাকশ্যপ তাড়াতাড়ি নিজের সজ্ঞাটি চীবর চার ভাঁজ করে বুদ্ধকে বসতে দিলেন। বুদ্ধ বললেন : কশ্যপ, তোমার সজ্ঞাটি চীবরখানা অতি মন্দ। মহাকশ্যপ ভাবলেন, শাস্তা যখন চীবরখানা মন্দ বলছেন, তাহলে তা পরিধান করতে তাঁর কোনো আপত্তি থাকবে না। এই কথা ভেবে কশ্যপ বললেন ; ভন্তে, ভগবান, এই সজ্ঞাটি চীবর আপনি পরিধান করুন। বুদ্ধ সেটা গ্রহণ করেন এবং বিনিময়ে তাঁকে “বুদ্ধের নিজের পরনের” কাপড় প্রদান করেন। এভাবে তাঁদের মধ্যে চীবর বিনিময় হয়। কশ্যপের চীবর বুদ্ধ এবং বুদ্ধের চীবর কশ্যপ পরিধান করলেন।

দীক্ষা গ্রহণের আট দিন পর মহাকশ্যপ অর্হত ফল লাভ করেন। গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষুদের ডেকে মহাকশ্যপের অশেষ গুণের প্রশংসা করলেন। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাঁর অশেষ গুণরাশির কথা বিবেচনা করে ভিক্ষুগণ তাঁকে অগ্রমহাশ্রাবক পদে অধিষ্ঠিত করেন। অন্যদিকে ভদ্রা কপিলানিও মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর ধর্মবাণী সংগ্রহের জন্য এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যা প্রথম মহাসঙ্গীতি নামে অভিহিত। মহাকশ্যপ থের সেই সঙ্গীতিতে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন। ধর্মবাণী সংগ্রহের জন্য তিনি পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচন করেন। তিনি সভাপতির আসন অলংকৃত করে উপালিকে বিনয় এবং আনন্দকে ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। তাঁদের ব্যাখ্যাকৃত ধর্ম-বিনয় উপস্থিত ভিক্ষুসংঘ অনুমোদন করেন। এভাবে মহাকশ্যপ থের'র সভাপতিত্বে প্রথম মহাসঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী ধর্ম-বিনয় হিসেবে সংগৃহীত হয়।

মহাকশ্যপ বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন। তিনি মহাজ্ঞানী এবং শীলবান ভিক্ষু ছিলেন। মহাপরিনির্বাণের পর মল্লরা বুদ্ধের দেহ শশ্বানে দাহ করতে অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা একে একে ব্যর্থ হয়ে যায়। শেষে মহাকশ্যপ থের বুদ্ধের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বন্দনা করেন। তারপর বুদ্ধের চিতায় আপনা আপনি আগুন জ্বলে ওঠে। অর্হত ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি ভিক্ষুদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন। কয়েকটি উপদেশ নিচে তুলে ধরা হলো।

- ১। ভিক্ষুগণ বহুপরিষদ পরিবেষ্টিত হয়ে বাস করবে না। কারণ পরিষদ পরিচালনায় চিন্ত বিকারহস্ত হয়। বহুজনের সঙ্গে একাগ্রতা নষ্ট করে। ফলে সমাধি দুর্লভ হয়। নানাজনের নানা রূচি পূর্ণ করা দুঃখকর। এ কারণে পরিষদ পরিচালনায় বহুবিধ দোষ জ্ঞান চক্ষে দেখে তা হতে বিরত থাকবে।
- ২। প্রব্রজিতরা কখনো পৌরহিতে আত্মনিয়োগ করবে না। কারণ পৌরহিত কাজে চিন্ত বিকারহস্ত হয়। ভিক্ষুগণ রস ও ত্বক্ষায় অনুরক্ত হয়। ফলে মার্গফল লাভ হতে বন্ধিত হয়।
- ৩। ভিক্ষুগণ বহুকাজে যোগদান করবে না। পাপীমিত্র বর্জন করবে। বস্তুগত লাভ বৃদ্ধির চেষ্টা করবে না। রসত্বশায় অভিভূত ভিক্ষু শীলবিশুদ্ধি পরিত্যাগ করে থাকে।
- ৪। যাঁদের লজ্জা-ভয় সর্বদা বিদ্যমান থাকে তাঁদের ব্রহ্মাচর্য গুণ শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাঁরা পুনরায় জন্মাহণ করেন না।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

কার সভাপতিত্বে এবং কীভাবে বুদ্ধের ধর্মবাণী সংগৃহীত হয়েছিল ?
মহাকশ্যপ থের'র কয়েকটি উপদেশ লেখ।

পাঠ : ২

উৎপলবর্ণ

খন্দি শব্দের অর্থ হচ্ছে ধ্যান-সাধনার প্রভাবে অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন। গৌতম বুদ্ধের শিষ্য ও শিষ্যদের মধ্যে অনেকে খন্দিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে থেরী উৎপলবর্ণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তবে এই খন্দিশক্তি তিনি এক জন্মে লাভ করেননি। এজন্য তাঁকে বহু জন্মে সাধনা করতে হয়েছিল। জানা যায়, পদুমুক্তর বুদ্ধের সময় তিনি হংসবতী নগরের এক সন্তান বৎশে জন্মাহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বড় হয়ে তিনি প্রায়ই পদুমুক্তর বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনতে বিহারে যেতেন। একদিন বিহারে গিয়ে দেখেন পদুমুক্তর বুদ্ধ একজন ভিক্ষুণীকে শ্রেষ্ঠ খন্দিমতীর স্থান দিয়েছেন। এটি দেখে তাঁর মনের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ খন্দিমতী হওয়ার ইচ্ছা জাগে। তখন তিনি এক সঙ্গাহব্যাপী পদুমুক্তর বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের ভক্তি সহকারে মহাপূজা দান করেন। পূজা শেষে তিনি পদুমুক্তর বুদ্ধকে বন্দনা করে শ্রেষ্ঠ খন্দিমতী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। পদুমুক্তর বুদ্ধ তাঁর ইচ্ছা পূরণ হওয়ার জন্য আশীর্বাদ করেন।

অতঃপর বহু জন্মের পুণ্য সঞ্চয় করে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবণীর এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে তিনি জন্মাহণ করেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয় উৎপলবর্ণ। উৎপল শব্দের অর্থ নীল পদ্ম। তাঁর গায়ের রং ছিল নীল পদ্মের মতো। তাই এরূপ নামকরণ করা হয়েছিল। শুধু বৃপেই নয় গুণেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। আস্তে আস্তে উৎপলবর্ণ বড় হলেন। তাঁর বৃপ ও গুণের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর বৃপে-গুণে আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে রাজা, মহারাজা ও শ্রেষ্ঠীগণ তাঁর পিতার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। শ্রেষ্ঠী বুঝতে পারলেন মহাবিপদ সন্ধিকটে। এক রাজার সঙ্গে মেয়েকে বিয়ে দিলে অন্য রাজা অসন্তুষ্ট ও ঝুঁক হবেন। এতে শত্রুতা বাঢ়বে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে। অনেক মানুষের মৃত্যু হবে। এই বিপদ থেকে উদ্বার পাওয়ার জন্য তিনি উপায় খুঁজতে থাকেন। অবশেষে উপায় স্বৰূপ তিনি কন্যাকে বললেন,

মা, তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারবে কি? তাঁর ছিল অতীত জন্মের সংগঠিত পুণ্যরাশি। খুশি হয়ে উৎপলবর্ণা পিতাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের সম্মতি প্রদান করেন। পিতাও খুশি হয়ে উৎপলবর্ণাকে ভিক্ষুণীদের কাছে নিয়ে গেলেন। ভিক্ষুণীরা তাঁকে প্রব্রজ্যা দান করলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের অল্প দিনের মধ্যেই উৎপলবর্ণার ওপর উপোসথ কক্ষের কিছু কাজের ভার অর্পিত হলো। দায়িত্ব হিসেবে তিনি উপোসথ গৃহের বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করতেন। তিনি ধ্যানসাধনায় আত্ম নিয়োগ করেন। সাধনার বলে তিনি প্রথমে পূর্বজন্মের স্মৃতি, পরচিত্ত জ্ঞান, দিব্যচক্ষু, দিব্যশুভ্রতি জ্ঞান ও ঋদ্ধিশক্তি লাভ করলেন। পরিশেষে অর্হতফল লাভ করলেন।

বুদ্ধ জেতবনে সংঘ সম্মেলনে কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ উৎপলবর্ণাকে ঋদ্ধিশক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠার আসন দান করেন। অর্হত ফল লাভ করে উৎপলবর্ণা সাধনা ও সিদ্ধির পরম সুখ চিন্তা করে কতগুলো গাথা আবৃত্তি করেন। গাথাগুলোর মধ্যে কয়েকটির বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো।

- ১। পূর্বজন্মের স্মৃতি আমার অধিকারে। পরচিত্ত জ্ঞান আমি অর্জন করেছি। দিব্যচক্ষু ও দিব্যশুভ্রতি আমার অধিকারে।
- ২। আমি ঋদ্ধিপ্রাণ। আমি আসবমুক্ত। আমি ষড় অভিজ্ঞতায় পারদর্শিনী। বুদ্ধ শাসনে যুক্ত হওয়ায় আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।
- ৩। চিন্ত আমার বশীভূত। আমি ঋদ্ধিপাদে প্রতিষ্ঠিত। ষড় অভিজ্ঞায় পারদর্শিনী। কাম, ত্বক্ষণ ও ক্ষমসমূহ শূলের ন্যায় বিন্ধ করে। ভোগের আনন্দ আমার কাছে তুচ্ছ। অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত করে আমি সর্ববিধ ভোগত্বার বিনাশ সাধন করেছি।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎপলবর্ণা প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করলে কী সমস্যা সৃষ্টি হতে পারত লেখ।

পাঠ : ৩

আন্তর্পালি

আন্তর্পালির জন্ম হয়েছিল বৈশালীর রাজোদয়ানের একটি বড় আম গাছের নিচে। উদ্যান রক্ষক তাঁকে লালন পালন করেন। আম গাছের তলায় জন্ম বলে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল আন্তর্পালি। বয়স বাঢ়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্পালি অপূর্ব সুন্দরী হয়ে ওঠে। তাঁর রূপ সৌন্দর্যে আশ-পাশের রাজ্যের রাজপুত্রগণ মুগ্ধ ছিলেন। সকল রাজপুত্র যেভাবেই হোক তাঁকে বিয়ে করার সংকল্প করেন। কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না। তাঁকে বিয়ে করা রাজপুত্রদের মধ্যে মর্যাদার বিষয় হয়ে দেখা দিল। ফলে রাজপুত্রদের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হলো। ত্রুটি এই কলহ যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করল। অবশেষে কলহের অবসান ঘটানোর জন্য আন্তর্পালি কাউকেও বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি রাজনৰ্তকির জীবন বেছে নিলেন। ফলে সকল রাজপুত্রের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক সৃষ্টি হলো।

আন্তর্পালি ত্রুটি রাজ-রাজাদের কাছ থেকে অনেক অর্থ-বিন্দু ও ভূ-সম্পত্তি লাভ করলেন। মধ্য বয়সে একদিন বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে তিনি অনিয়তভাবে উপলব্ধি করলেন। বুবতে পারলেন দেহ, রূপ, যৌবন সবই নশ্বর

এবং ক্ষণস্থায়ী। অতঃপর ধর্মদেশনা শোনার জন্য সশিষ্য বুদ্ধকে তিনি নিমত্তণ করলেন। বুদ্ধ নিমত্তণ গ্রহণ করে আশ্রপালির গৃহে উপস্থিত হন। আশ্রপালি বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের শ্রদ্ধাসহকারে খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। বুদ্ধ আশ্রপালির মধ্যে বিমুক্তির লক্ষণ দেখে তাঁকে ধর্মদেশনা করেন। বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে আশ্রপালি নিজের উদ্যানে বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ ও বুদ্ধশিষ্যদের দান করেন। এ সময় তিনি বুদ্ধের ধর্মনীতি অনুশীলনে ব্রতী হয়ে ভিক্ষুণী ধর্মে দীক্ষিত হন। দীক্ষিত হয়ে তিনি ধ্যান-সাধনায় মনোনিবেশ করেন। অনিত্যতাকে ধ্যানের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে তিনি ধ্যান সমাধির অনুশীলন শুরু করেন। ক্রমে তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। ফলে তিনি অতীত জীবনের ঘটনাবলি দেখতে পেতেন।

অর্তদৃষ্টি লাভ করে একদিন তিনি নিজের অতীত জীবনের ঘটনা অবলোকন করছিলেন। তিনি দেখলেন যে, জন্ম-জন্মান্তরে বিভিন্ন ভালো কাজের মাধ্যমে সঞ্চিত পুণ্যরাশির ফলে তিনি শিখী বুদ্ধের সময় জন্মগ্রহণ করে ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তখন একদিন অন্যান্য ভিক্ষুণীদের সাথে তিনি চৈত্য পূজায় যোগদান করেন। পূজা শেষে চৈত্য প্রদক্ষিণের সময় তাঁর সামনে ছিলেন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ অর্হৎ ভিক্ষুণী। সেই ভিক্ষুণী হঠাতে চৈত্যের অঙ্গনে থুথু ফেলেন। এটি দেখে আশ্রপালি বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীকে লক্ষ করে কটুক্তি করেন। এই কটুক্তি জনিত পাপের ফলে গৌতম বুদ্ধের সময় তাঁকে ঘরের বাইরে গাছের নিচে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে এবং তিনি সংসার জীবনযাপন করতে পারেন নি।

তিনি সর্ব বস্তুর অনিত্যতাকে ধ্যানের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে ধ্যানে রাত হন। অর্হত ফল লাভ করে তিনি জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল ছিন্ন করেন এবং সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করেন। মুক্তির নির্মল আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে তিনি অনেকগুলো গাথা ভাষণ করেন। নিচে তাঁর ভাষিত গাথার সারমর্ম তুলে ধরা হলো :

‘একসময় আমার এই দেহ অপূর্ব সুন্দর ও লাভণ্যময় ছিল। জরাপ্রাপ্ত হয়ে তা এখন প্রলেপ খসে পড়া ঘরের মতো জীর্ণ হয়ে পড়েছে। মূলত এ দেহ দুঃখের আলয়।’

আশ্রপালির জীবন পাঠে আমরা দেখতে পাই, কর্মের প্রায়চিত্ত সকলকেই ভোগ করতে হয়। কর্মের ফল ভোগ থেকে কেউ রেহাই পায় না। ভালো কাজের সুফল যেমন আছে তেমনি খারাপ কাজের শাস্তিও রয়েছে। তাই মানুষকে সব সময় ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কাউকে কটু কথা বলা উচিত নয়। কর্মের পরিণাম চিন্তা করে সকলের অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

দেহ, বৃপ্তি, যৌবন সবই নশর এবং ক্ষণস্থায়ী – এ উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় কর।

পাঠ : ৪

শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক

বুদ্ধের জীবিতকালে ভিক্ষু ছাড়াও অনেক গৃহী বুদ্ধের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনাথপিণ্ডিক ছিলেন অঞ্চলগণ্য। সে সময়ে শ্রাবণকৃতীতে সুমন নামে এক শ্রেষ্ঠী বাস করতেন। সুদত্ত নামে তাঁর এক পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সুদত্ত উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার বিশাল ধনসম্পদের অধিকারী হন। এরকম ধনবানদের শ্রেষ্ঠী বলা হয়। সুদত্ত শ্রেষ্ঠী অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। গরিব ও দুঃখীদের তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। কোনো অসহায় মানুষ তাঁর বাড়ি থেকে শূন্য হাতে ফিরে যেত না। বিশেষত তিনি অনাথদেরে

পিণ্ড দান করতেন। পিণ্ড হলো আহার বা খাদ্যদ্রব্য। অনাথদের অকাতরে পিণ্ড দান করতেন বলেই সকলের কাছে তিনি ‘অনাথপিণ্ডিক’ নামে পরিচিত হন।

এক সময় বুদ্ধ রাজগ্রহের জেতবনে অবস্থান করছিলেন। সে সময় অনাথপিণ্ডিক ব্যবসার কাজে রাজগ্রহে আসেন। সেখানে এক শ্রেষ্ঠী বন্ধুর বাড়িতে তিনি অতিথি হন। আগেও অনাথপিণ্ডিক করেকবার বন্ধুর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। তখন তিনি অনেক আদর যত্ন লাভ করেছিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁকে আগের মতো সমাদর করতে কেউ এগিয়ে এলো না। তাঁর বন্ধুও ছিলেন খুব ব্যস্ত। তিনি বন্ধুর নিকট ব্যস্ততার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বন্ধু তাঁকে বললেন, আমি বুদ্ধকে নিমজ্জন করেছি। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যসহ আমার বাড়িতে আসবেন। তাঁকে সেবা-যত্ন ও আপ্যায়ন করার জন্য আমরা সবাই ব্যস্ত।

বুদ্ধের আগমনের কথা শুনেই অনাথপিণ্ডিকের মন আনন্দে ভরে উঠল। তিনি আর কিছুই বললেন না। সে রাতে ভালো করে ঘুমাতেও পারলেন না। খুব ভোরে উঠে তিনি জেতবনে বুদ্ধের কাছে গেলেন। বুদ্ধ তখন চৎক্রমণ করছিলেন। শ্রেষ্ঠী বুদ্ধকে বন্দনা করে এক পাশে বসলেন। বুদ্ধ তাঁর মনের অবস্থা জেনে তাঁকে ধর্মদেশনা করলেন। বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে অনাথপিণ্ডিক সেখানেই শ্রোতাপন্তি ফল লাভ করলেন। শ্রোতাপন্তি হল নির্বাণ লাভের প্রথম ধাপ। মনের একাত্মতা সাধনের মাধ্যমে এটি অর্জিত হয়। ফেরার সময় অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধকে শ্রাবণ্তীতে বর্ষাবাস যাগনের জন্য আমজ্ঞণ জানান। বুদ্ধ তাঁর আমজ্ঞণ গ্রহণ করেন।

অনাথপিণ্ডিক শ্রাবণ্তীতে ফিরে গিয়ে ‘কী করলে বুদ্ধ খুশি হবেন’ এ বিষয়ে ভাবতে লাগলেন। শ্রাবণ্তীতে রাজকুমার জেত-এর মনোরম একটি উদ্যান ছিল। তাঁকে অনেক অনুরোধ করে আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে সেই উদ্যান ক্রয় করলেন। সেখানে নির্মাণ করলেন মনোরম মহাবিহার। এই বিহারের মাঝাখানে বুদ্ধের জন্য নির্মিত হয় ‘মূলগন্ধকুটি বিহার’। এর চারদিকে নির্মিত হয় আটজন স্থবিরের জন্য পৃথক ভবন। এ ছাড়া সেখানে নির্মিত হল চৎক্রমণশালা, ভিক্ষুদের জন্য আশ্রম, দিঘি প্রভৃতি। রাজগ্রহ থেকে শ্রাবণ্তীর দূরত্ব প্রায় নবই মাইল। তিনি বুদ্ধের যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রতি দুই মাইল অন্তর মোট পঁয়তাঙ্গিশটি বিশ্রামাগার নির্মাণ করালেন। এসব নির্মাণে খরচ হয় আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা।

তিনি মাস ধরে চলে বিহারে দান অনুষ্ঠানের উৎসব। এ অনুষ্ঠানেও খরচ হয় আরও আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা। রাজকুমার জেত-এর নাম অনুসারে এই জায়গার নাম রাখা হয় জেতবন। বিহারের নাম রাখা হয় ‘অনাথপিণ্ডিকের’ আরাম। অনাথপিণ্ডিক অত্যন্ত বুদ্ধ ভক্ত ছিলেন। প্রতিদিন তিনবেলা তিনি সেই বিহারে যেতেন। বুদ্ধকে পূজা বন্দনা করতেন। বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনতেন। অনাথপিণ্ডিকের বাড়িতে প্রতিদিন পাঁচশত ভিক্ষুর জন্য খাদ্য প্রস্তুত থাকত। বুদ্ধ উনিশবার অনাথপিণ্ডিকের আরামে বর্ষাবাস যাগন করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে অনাথপিণ্ডিকের অবদান শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণযোগ্য।

দান কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ অনাথপিণ্ডিক বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। এখন ও বিশ্ব বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করে। তাঁর প্রশংসা করে। তাঁর দান কর্মে উন্নুন্ধ হয়ে দান ও সেবায় ব্রতী হতে চেষ্টা করে।

অনাথপিণ্ডিকের জীবনী পাঠে বোঝা যায় যে, দান মানুষকে মহৎ করে। দানের মাধ্যমে পুণ্য, যশ-খ্যাতি, শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লাভ হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

তোমার এলাকায় ধনী ব্যক্তিদের দানে নির্মিত প্রতিষ্ঠান বা মঙ্গলজনক কর্মসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. মহাকশ্যপ ছিলেন বুদ্ধের প্রথম |
২. গৌতম বুদ্ধ তখন বেগুবনের ----- অবস্থান করছিলেন |
৩. দীক্ষা গ্রহণের..... দিন পর মহাকশ্যপ থের অর্হত ফল লাভ করেন |
৪. থেরী উৎপলবর্ণ ভিক্ষুণীদের মধ্যে ঋদ্ধিশক্তিতে..... ছিলেন |
৫. তাঁর গায়ের রং ছিল ----- মতো |
৬. ভালো কাজেরযেমন আছে তেমনি খারাপ কাজেরও রয়েছে |
৭. দান কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ ----- বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন |

মিলকরণ

বাম	ডান
১. মহাকশ্যপ বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের	অকুশল কর্ম বর্জন করতে হবে
২. প্রাচীনকালে ধনবানদের বলা হয়	অন্যতম ছিলেন
৩. থের-থেরীর মধ্যে ঋদ্ধিশক্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন	জেতবন
৪. কর্মের পরিগাম চিন্তা করে সকলকে	উৎপলবর্ণ
৫. জেত এর নাম অনুসারে স্থানটির নাম রাখা হয়	শ্রেষ্ঠী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পিপ্পলী মানবের গৃহত্যাগের মূহূর্তে কেন পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়েছিল ?
২. আশ্রমালি নামকরণের কারণ কী?
৩. অনাথপিণ্ডিক কোথায় বিহার নির্মাণ করেছিলেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. থের মহাকশ্যপের ত্যাগের কাহিনী বর্ণনা কর।
২. উৎপলবর্ণ কীভাবে ঋদ্ধিশক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠার আসন লাভ করেছিলেন লেখ।
৩. আশ্রমালির জীবনী হতে কর্ম ও কর্মফল সম্পর্কে আমরা কী শিক্ষা পাই আলোচনা কর।
৪. সুদৃঢ় শ্রেষ্ঠী কেন 'অনাথপিণ্ডিক' নামে পরিচিত হলেন তার বর্ণনা দাও।

ବ୍ୟାନିର୍ବାଚନ ପତ୍ର

১. বুদ্ধের প্রথম মহাশ্রাবকের নাম কী?

- গ. অনাথপিণ্ডিক

১২. ‘পিট’ শব্দের অর্থ কী?

৩. কপিল ব্রাহ্মণ ও ভদ্রা কপিলানি সংসার জীবন ত্যাগ করেছিলেন কেন?

- ক. অতীতকালে ব্রহ্মালোকে ছিলেন বলে

- খ. উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল বলে

- ### গ. সামাজিক বাধা ছিল বলে

- ## ঘ. আত্মীয়-স্বজনের কৃপ্তিরোচনায়

নিচের উদ্ধীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাস্তির এক নোংরা পরিবেশে সূচনার জন্য। বড় হয়ে অপূর্ব সুন্দরী হওয়ার কারণে অনেক ধনীর দুলালের নজরে পড়ে। তাদের কুণ্ডল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি ভিক্ষুর ধর্মদেশনা শ্রবণ করে প্রব্রজ্যায় দীক্ষিত হন এবং ধ্যান-সাধনার মাধ্যমে ঋক্ষিণ্ণি লাভ করে।

৪. সূচনার মানসিক পরিবর্তনে উৎপলবণ্ণার যে দিকটি লক্ষণীয় -

- i. অনিত্যতা
 - ii. বিমুক্তি
 - iii. নশ্বর

ନିଚେର କୋନଟି ସଠିକ ?

৫. উক্ত ধ্যান-সাধনার ফলে সূচনা কী অর্জন করতে পারে?

সূজনশীল প্রশ্ন

১. সুচিত্রা ও অর্পনা দুই বোন। বৃপে ও গুণে দুজনে অপরূপ। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে সুচিত্রা বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনতে বিহারে যেতেন এবং শ্রেষ্ঠ ভিক্ষুণী হওয়ার ইচ্ছা করতেন। পড়াশুনা শেষে তাদের পিতা সুচিত্রাকে বিয়ে দেওয়ার কথা বললে সে অনীহা ধর্কাশ করে। কিন্তু সুচিত্রার বূপ ও গুণের কথা শুনে অনেক সন্তুষ্ট পরিবার থেকে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব আসে। এ অবস্থায় বিয়ে হলে এলাকার সন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কলহ ও রক্তপাত ঘটবে বিধায় পিতা মেয়ের সমতিতে ‘সুচিত্রাকে’ প্রবজ্ঞা গ্রহণ করান। অন্যদিকে অর্পনাকে বিয়ে করা নিয়ে উক্ত এলাকায় যুবকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। অর্পনা বিয়েতে রাজি না হয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। একসময় বিহারে ধর্মচার্য অনুপ্রাণিত হলে, তাঁর মনে হয় দেহ, বূপ ও যৌবন সবই ক্ষণস্থায়ী ও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।
 - ক. বুদ্ধের প্রথম মহাশ্রাবক কে ছিলেন ?
 - খ. প্রথম মহাসজীতি কেন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ? ব্যাখ্যা কর।
 - গ. উদ্বীপকে বর্ণিত সুচিত্রার ঘটনাটি কোন থেরীর জীবনের সঙ্গে মিল রয়েছে ? বর্ণনা কর।
 - ঘ. ‘দেহ, বূপ, যৌবন’ সবই ক্ষণস্থায়ী ও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে’—অর্পনার এই উক্তিটির সঙ্গে আত্মপালির জীবন কাহিনি কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ ? বিশ্লেষণ কর।
২. বিধান ও নীলিমা উভয়ে ধার্মিক ছিলেন এবং তাঁদের গুণকীর্তন গ্রামের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। একসময় দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও তাদের সৎসার জীবনের চেয়ে ব্রহ্মচর্যার প্রতি বেশি আগ্রহ ছিল। একসময় তারা এক ধর্মীয় পথ প্রদর্শকের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রলয়ংকরী বিকট শব্দে পৃথিবী কেঁপে উঠল। এভাবে তাদের ধর্মযাত্রা সফল হয়।
 - ক. ‘ঝদি’ শব্দের অর্থ কী ?
 - খ. ভিক্ষুগণ মহাকশ্যপকে অগ্রমহাশ্রাবক পদে অধিষ্ঠিত করেন কেন ?
 - গ. উদ্বীপকের ঘটনাটি কোন থের – থেরীর জীবনে সংঘটিত হয়েছিল ? ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. উদ্বীপকে বর্ণিত বিধান ও নীলিমা ইহ ও পরজন্মে কী লাভ করতে পারবে বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

নবম অধ্যায়

জাতক

জাতক সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের একটি অনন্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের বিভিন্ন কাহিনি ও ঘটনা বর্ণিত আছে। জাতকের কাহিনিগুলো নৈতিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ। জাতকগুলোতে প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাই জাতককে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উৎস বা আধার হিসেবে গণ্য করা হয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস রচনায় জাতকের গুরুত্ব অপরিসীম। এশিয়া মহাদেশের সাহিত্যের বিকাশ সাধনেও জাতকের অসীম প্রভাব রয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা জাতকের উৎপত্তি, গঠনশৈলী এবং কয়েকটি জাতক পাঠ করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- * জাতকের উৎপত্তি এবং জাতকের গঠনশৈলী ব্যাখ্যা করতে পারব।
- * জাতকের বিভিন্ন কাহিনি বর্ণনা করতে পারব।
- * জাতক পাঠ করে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

জাতকের উৎপত্তি ও গঠনশৈলী

বৌদ্ধধর্ম অনুসারে এক জন্মের কর্মফলে কেউ বুদ্ধ হতে পারেন না। বৌদ্ধিসত্ত্ব নানাক্রপে নানাক্রলে জন্মগ্রহণ করে দান, শীল, পারমী ইত্যাদি পালনপূর্বক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। প্রত্যেকটি জন্মে তিনি হিতকর কর্ম সম্পাদন করেন এবং নিজেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। বৌদ্ধিসত্ত্ব পাঁচশ' পঞ্চাশতম জন্মে বৌদ্ধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হন।

বুদ্ধত্ব লাভ করে তিনি অতীত জন্মসমূহের ঘটনাবলি দেখার সহায়ক জ্ঞানচক্ষু লাভ করেন। তিনি পূর্বজন্মের সব ঘটনা চোখের সামনে দেখতে পেতেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি এই অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তিনি শিষ্যদের ধর্মদেশনা করার সময় কথা প্রসঙ্গে তাঁর অতীত জীবনের বিভিন্ন কাহিনি ও ঘটনাবলি বলতেন। শিষ্যরা মনোযোগ সহকারে কাহিনিগুলো শুনতেন এবং স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন। পরবর্তীকালে সজীতির মাধ্যমে এগুলো সংকলিত হয়। এই কাহিনিগুলোই জাতক নামে পরিচিত।

সাধারণ অর্থে ‘জাতক’ শব্দের অর্থ ‘যে জন্মগ্রহণ করেছে’। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে জাতক শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের কাহিনিগুলো জাতক নামে অভিহিত। জাতকের সব কাহিনিই উপদেশমূলক। মানুষকে কুশলকর্ম সম্পাদনে উদ্বৃদ্ধ করাই জাতকের উদ্দেশ্য। অতএব বলা যায়, গৌতম বুদ্ধের বৌদ্ধিসত্ত্বকালীন জন্মকাহিনি থেকে মানুষকে নৈতিক শিক্ষায় উদ্বৃদ্ধ করার নিমিত্তে জাতকের উৎপত্তি হয়।

জাতকের গঠনশৈলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রত্যেকটি জাতক প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত :
ক. প্রভৃত্যৎপন্নবস্তু, খ. অতীত বস্তু বা মূল আখ্যান এবং গ. সমবধান।

প্রতুৎপন্নবস্তু : জাতকের প্রথম অংশের নাম প্রতুৎপন্নবস্তু। একে বর্তমান কথাও বলা হয়। এই অংশে বুদ্ধি কার উদ্দেশ্যে, কী উপলক্ষে কাহিনিটি বলেছিলেন তার বর্ণনা রয়েছে। এই অংশটিকে জাতকের উপকৰ্মনিকা বা ভূমিকাও বলা হয়।

অতীতবস্তু : জাতকের দ্বিতীয় অংশ হলো অতীতবস্তু। এই অংশে শগবান বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত এবং সে সময়কার বিভিন্ন ঘটনাবলি বর্ণিত আছে। এই অংশটিই প্রকৃত জাতক কাহিনি। তাই একে মূল আখ্যায়িকাও বলা হয়।

সমবধান : জাতকের তৃতীয় অংশের নাম সমবধান। জাতক কাহিনিতে বর্ণিত পাত্র এবং গৌতম বুদ্ধ যে অভিন্ন তা প্রদর্শন করাই এই অংশের উদ্দেশ্য। এই অংশকে সমাধানও বলা হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

জাতক শব্দের অর্থ কী?

জাতক বলতে কী বোঝা?

পাঠ : ২

জাতক পাঠের প্রয়োজনীয়তা

গৌতম বুদ্ধ জাতকের কাহিনির মাধ্যমে ধর্মের গভীর মর্মবাণী সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এজন্য জাতক শুধুমাত্র কাহিনি নয়, এগুলো শগবান বুদ্ধের উপদেশও। প্রতিটি জাতকে তিনি একেকটি নৈতিক শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরেছেন। তাই জাতক পাঠ করে নৈতিক শিক্ষা লাভ করা যায়।

জাতক প্রাচীন ইতিহাসের এক অফুরন্ত ভাঙ্ডার। জাতকে বুদ্ধের সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, ধর্ম-দর্শন, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। তাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জ্ঞানের জন্য জাতক পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।

বৌদ্ধরা কর্মফল বিশ্বাস করে। জাতকে কর্মফল সম্পর্কে প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জাতক পাঠ করে সৎ ও অসৎ কর্মের পরিণতি সম্পর্কে জানা যায়। ফলে মানুষ অসৎ কর্ম বর্জন এবং সৎ কর্ম করতে উৎসাহী হয়। জাতক পাঠে কুসংস্কার দূর হয়। নক্ষত্র জাতকে কুসংস্কারের ফলে গ্রামবাসীরা দূরবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। জাতকে কুশলকর্মের দ্বারা কুশল ফল এবং অকুশলকর্মের দ্বারা অকুশল ফল লাভের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ‘কালকর্ণি জাতক’ থেকে আমরা বিপদের দিনে বন্ধুকে কীভাবে সাহায্য করতে হয় তা শিক্ষা লাভ করতে পারি। বোধিসত্ত্বের অবর্তমানে তার বাল্যকল্পু কালকর্ণি ডাকাতদলের হাত থেকে বোধিসত্ত্বের সমন্ত

জাতকের কাহিনিগুলোতে সদাচরণ, জীবে দয়া, সংযম, দানের মহিমা, নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন ও উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে হিতোপদেশ রয়েছে। এগুলো বুদ্ধের জন্ম-জন্মান্তরের পারমী পূরণের কথা। এসব গুণাবলি নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনে সহায়ক। বন্ধু-বন্ধব কেউ বিপথগামী হলে তাকে জাতকের শিক্ষার মাধ্যমে সৎপথে ফিরিয়ে আনা যায়। তাই সুস্থ পারিবারিক ও সমাজজীবন গঠন এবং ব্যক্তি জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য জাতকের গল্লগুলো পড়া উচিত।

এখানে কয়েকটি জাতকের কাহিনি বর্ণনা করা হলো।

অনুশীলনমূলক কাজ

জাতক পাঠ করে কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?

পাঠ : ৩

বানরেন্দ্র জাতক

বারানসিরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বৌধিস্ত্র একবার বানররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পূর্ণ বয়সে তিনি ছিলেন অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তিনি একাকী এক নদীর তীরে বিচরণ করতেন। নদীর অপর পারে ছিল একটি আম-কঁচালের দ্বীপ। বৌধিস্ত্র যে নদীর তীরে থাকতেন সে নদীর মাঝখানে একটি শৈল পর্বত ছিল। বৌধিস্ত্র প্রতিদিন নদী তীর থেকে এক লাফে সেই পর্বতের ওপর এবং সেখান থেকে এক লাফে দ্বীপে গিয়ে পড়তেন। সেই দ্বীপে তিনি পেটভরে আম-কঁচাল খেয়ে সম্ম্যার সময় ঠিক একই ভাবে নদী পার হয়ে ফিরে আসতেন।

ঐ নদীতে বাস করত সন্তোষ এক কুমির। বৌধিস্ত্রকে প্রতিদিন নদী পারাপার হতে দেখে কুমিরের অন্তঃসন্ত্বাস্ত্রীর তাঁর হৃৎপিণ্ড খাওয়ার সাধ হলো। সে তার সাধের কথা কুমিরকে জানাল। স্ত্রীর সাধ পূরণের উদ্দেশ্যে কুমির সম্ম্যার সময় বৌধিস্ত্রকে ধরার জন্য পর্বতের ওপর উঠে বসে থাকল।

বৌধিস্ত্র প্রতিদিন সম্ম্যার সময় ফেরার আগে নদীর জল কতদুর বাড়ল, শৈল কতদুর জেগে থাকল তা মনোযোগ সহকারে দেখে নিতেন। সেদিন সারাদিন বিচরণপূর্বক সম্ম্যাকালে পর্বতের দিকে তাকিয়ে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি লক্ষ করলেন, নদীর জল বাড়েওনি কমেওনি, অথচ পর্বতের উপরিভাগ উঁচু হয়ে আছে। তাঁর মনে সন্দেহ হলো। নিশ্চয় তাঁকে ধরার জন্য কুমির পর্বতের ওপর উঠে বসে আছে। তিনি বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে চিংকার করে পর্বতকে ডাকতে থাকলেন, ‘ওহে পর্বত’। কোনো উত্তর না পেয়ে আবার ডাকলেন। এতেও কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি বললেন, ‘তাই পর্বত! আজ কোনো উত্তর দিছ না কেন?’

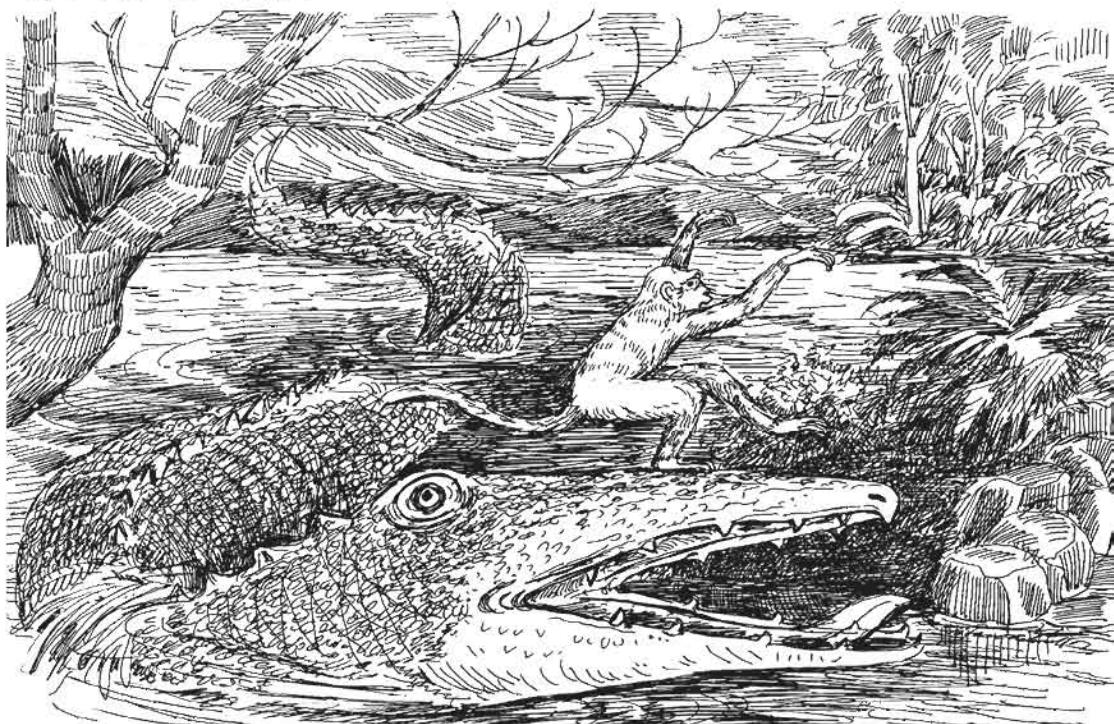
কুমির ভাবল, এই পর্বত নিশ্চয় প্রতিদিন বানরের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। আজ আমি পর্বতের পরিবর্তে সাড়া দিই। তখন সে উত্তরে বলল, ‘কে, বানরেন্দ্র নাকি?’

বৌধিস্ত্র জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কে?’ সে উত্তর দিল, আমি কুমির।

-তুমি পর্বতের ওপর বসে আছ কেন?

-আমার অস্তিসন্দেশ জীর তোমার কলিজা খাওয়ার সাধ হয়েছে। তাই তোমাকে ধরতে বসে আছি।

-কুমির ভাই, আমি তোমাকে ধরা দিচ্ছি। তুমি হাঁ কর, আমি তোমার মুখের ভিতর লাক্ষিয়ে পড়ছি। তখন তুমি আমায় ধরতে পারবে।



কুমির ও বানর

কুমির যখন মুখ হাঁ করে তখন তার দৃঢ়োখ দিয়ে কিছুই দেখতে পায় না। বোধিসন্দেশ যে কৌশলে নিজের জীবন রক্ষা করতে চেষ্টা করছিলেন কুমির তা বুঝতে পারেনি। সে বোধিসন্দেশের কথামতো মুখ হাঁ করে চোখ বন্ধ করে রইলো। এই অবস্থায় বোধিসন্দেশ এক লাফে তার মাথার উপর এবং আরেক লাফে খুব দুর্ভগতিতে নদীর ওপারে পৌছে গেলেন। কুমির এই কাঙ দেখে অবাক হয়ে বানরের উদ্দেশ্যে বললো, ‘বানরেন্দ্র, চারটি গুণ ধাকলে সব শত্রু জয় করা যায়। সে চারটি গুণ হলো - সত্য, ধৈর্য, ত্যাগ আর বিচক্ষণতা। তোমার মধ্যে এই চারটি গুণই আছে। তোমাকে নমস্কার।’

এভাবে বানরবৃঙ্গী বোধিসন্দেশের প্রশংসন করে কুমির চলে গেল।

উপদেশ : ধৈর্য ও বুদ্ধি দিয়ে বিপদের মোকাবিলা করতে হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

বানর কেমন করে এপার থেকে ওপারে যেত?

বানর কীভাবে কুমিরের হাত থেকে রক্ষা পেল?

বুদ্ধি দিয়ে তোমরা কোনো বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে থাকলে তা বর্ণনা কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৪

দেবধর্ম জাতক

পুরাকালে বারানসি রাজ্যে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। সে সময় বৌদ্ধিসন্ত রাজকুমারবৃপ্তে জন্মাইছেন করেন। তাঁর নাম হলো মহিংসাস কুমার। তাঁর জন্মের দুই-তিনি বছর পর এক ছোট ভাই জন্ম গ্রহণ করে। তাঁর নাম হলো চন্দ্রকুমার। চন্দ্রকুমার একটু বড় হলে রানি পরলোক গমন করেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত তখন পুনর্বার বিবাহ করেন। কিছুদিন পর ছোট রানির এক ছেলে হলো। সেই ছেলের নাম হলো সূর্যকুমার। রাজা তখন খুব খুশি হয়ে রানিকে বর চাইতে বললেন। রানি তখন কোনো বর নিলেন না। তিনি বললেন, মহারাজ, এখন থাক, পরে আমি এই বর চেয়ে নেব।

সূর্যকুমার বড় হলো। রানি তখন রাজাকে বললেন, ‘সূর্যকুমারের জন্মের সময় আপনি আমাকে একটি বর দিতে চেয়েছিলেন। এখন সেই বর আমাকে দিন। আমার ছেলেকে রাজা করে নিন। ব্রহ্মদত্ত বললেন, আমার বড় দুই ছেলে আগন্তের মতো তেজস্বী। আমি তাদের রেখে ছোট কুমারকে রাজা করতে পারি না। রানি রাজার কথায় শাস্ত হলেন না। তিনি দিনরাত রাজাকে এই নিয়ে বিরক্ত করতে লাগলেন। রাজাও এতে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি আশঙ্কা করলেন, রানির চক্রান্তে বড় দুই কুমারের ক্ষতি হতে পারে।

এই ভেবে রাজা বড় দুই কুমারকে ডেকে বললেন, ছেলেরা আমার, তোমাদের ছোট ভাইয়ের জন্মের সময় ছোট রানিকে আমি একটি বর চাইতে বলেছিলাম। বর স্বৰূপ এখন তিনি সূর্যকুমারকে রাজা করতে চান। কিন্তু সে রাজা হোক আমি তা চাই না। আমি আশঙ্কা করছি এজন্য ছোট রানি তোমাদের ক্ষতি করতে পারে। তোমরা এখন বনে গিয়ে আশ্রয় নাও। আমার মৃত্যুর পর নিয়ম অনুযায়ী বড় ছেলে রাজত্ব পাবে। তখন তোমরা সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিও। এই বলে তিনি বড় দুই ছেলেকে বিদায় দিলেন।

দুই কুমার পিতার আদেশে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ল। প্রাসাদের বাইরে তখন সূর্যকুমার খেলছিল। দুই ভাইয়ের মুখ থেকে বনে যাওয়ার কথা শুনে সেও ভাইদের সঙ্গে চলল। চলতে চলতে তিনি ভাই হিমালয় পর্বতে পৌছল। সেখানে বৌদ্ধিসন্ত এক গাছের তলায় বসে সূর্যকুমারকে বললেন, ওই সরোবরে গিয়ে স্নান করে এসো। জল খেয়ে এসো। আসার সময় পদ্মপাতায় করে আমাদের জন্য জল নিয়ে এসো।

সেই সরোবরে এক জলরাক্ষস বাস করত। জলরাক্ষস সরোবরটি পেয়েছিল এক কুবেরের কাছ থেকে। সরোবরটি দেওয়ার সময় কুবের তাকে বলেছিলেন, দেবধর্ম জ্ঞানহীন কোনো লোক যদি এই সরোবরে নামে একমাত্র তাকেই তুমি খেতে পারবে। কিন্তু জলে না নামলে তাকে তুমি খেতে পারবে না। সূর্যকুমার এসব কিছুই জানত না। সে জলে নামতেই জলরাক্ষস তাকে ধরে বলল, দেবধর্ম কাকে বলে জান? সূর্যকুমার বলল,

জানি, লোকে সূর্য ও চাঁদকে দেবতা বলে। রাক্ষস বলল, যিথে কথা। তুমি দেবধর্ম কী জানো না-এই কথা বলে সে সূর্যকুমারকে টেনে নিজের ঘরে নিয়ে বেঁধে রাখল।



তিনি রাজকুমার বলের দিকে যাচ্ছে

সূর্যকুমার ক্ষিরে আসতে দেরি করছে দেখে বৌদ্ধিসন্ত চন্দ্রকুমারকে ছোট ভাইয়ের খোঁজে পাঠালেন। জলরাক্ষস চন্দ্রকুমারকেও প্রশ্ন করল, দেবধর্ম কী? চন্দ্রকুমার যে উভর দিল, জলরাক্ষস তাতে সম্মত হতে পারল না। তাই চন্দ্রকুমারকেও নিজের ঘরে নিয়ে বেঁধে রাখল।

চন্দ্রকুমার ক্ষিরে আসছে না দেখে বৌদ্ধিসন্ত বুঝালেন দুই ভাই কোনো বিপদে পড়েছে। তাঁর সন্দেহ হলো নিশ্চয় ওই সরোবরে কোনো জলরাক্ষস আছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তীর, ধনুক ও তরবারি নিয়ে সরোবরের কুণ্ডে রাক্ষসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাক্ষস দেখল, বৌদ্ধিসন্ত জলে নামছেন না। তখন সে বনবাসী যানুষ সেঙ্গে বৌদ্ধিসন্তের সামনে এসে বলল, ‘ভাই, আপনি ক্লান্ত। সামনে চমৎকার সরোবর। ওখানে নেমে স্নান করুন। জলগান করুন। তাতে আপনার ক্লান্তি কেটে যাবে।’

বৌদ্ধিসন্ত জলরাক্ষসকে চিনতে পারলেন। জলরাক্ষসও উপায় না দেখে বৌদ্ধিসন্তের কাছে সব কথা শীকার করল। তখন বৌদ্ধিসন্ত বললেন, দেবধর্ম কী তা আমি জানি। তুমি আমার কাছ থেকে তা কী জানতে চাও?

রাক্ষস বলল, হ্যাঁ চাই।

তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, ‘এখন আমি খুব ক্লান্ত। আগে ক্লান্তি দূর করি। তারপর বলব।’ তখন রাক্ষস তাঁকে হান করতে দিল। খাদ্য ও পানীয় দিল। বসার জন্য বিচির আসন সাজিয়ে তাতে বসতে দিল। বোধিসত্ত্ব সেই আসনে বসলেন। রাক্ষস তাঁর পায়ের কাছে বসল। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, ‘শান্ত, সত্যপরায়ণ ও নির্মল অন্তরে যিনি ধর্মকাজ করেন তিনি দেবধর্ম পরায়ণ। মনে পাপ জাগলে যিনি নিজে লজ্জা পান তিনি দেবধর্ম পরায়ণ।’

এই ব্যাখ্যা শুনে রাক্ষস সন্তুষ্ট হয়ে বলল, আপনি পঞ্চিত। আমি আপনার কথায় সন্তুষ্ট হলাম। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আপনার একজন ভাইকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। বলুন, কাকে আনব? বোধিসত্ত্ব বললেন, আমার ছোট ভাইকে।

রাক্ষস বলল, আপনি দেবধর্ম জানেন। অথচ সেই অনুসারে কাজ করছেন না। মেজ ভাইয়ের বদলে ছোট ভাইকে ঢাইছেন কেন?

বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, আমি দেবধর্ম জানি এবং সেই অনুসারে কাজও করি। সবচেয়ে ছোট ভাইটি আমার সৎ ভাই। ওর জন্য আমরা বনবাসী হয়েছি। আমার বিমাতা ওকে রাজা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পিতা তাতে রাজি হননি। আমাদের ছোট ভাইটি সব শুনে আমাদের সঙ্গে বনবাসী হয়েছে। আমাদের ফেলে সে একদিনও রাজপুরীতে ফেরার কথা ভাবেনি। এখন ফিরে গিয়ে আমি যদি বলি তাকে রাক্ষস থেয়েছে তা কেউ বিশ্বাস করবে না। এজন্য আমি তাকে ঢাইছি।

রাক্ষস খুশি হয়ে দুই ভাইকে ফিরিয়ে দিল। তখন বোধিসত্ত্ব রাক্ষসকে বললেন, তুমি অতীত জন্মে পাপ করেছিলে বলে রাক্ষস হয়েছ। এতেও তোমার শিক্ষা হয়নি। এ জন্মেও তুমি পাপ করছ। এর ফলে তুমি মৃত্যুর পর নরকে থাকবে। কষ্ট পাবে। সুতরাং এখন থেকে সৎকর্ম কর, সৎপথে চলে এসো। তাহলে তুমি মুক্তি পাবে।

এভাবে জলরাক্ষসকে সৎ পথে এনে বোধিসত্ত্ব বনে বাস করতে লাগলেন। তারপর একদিন পিতার মৃত্যুর খবর পেয়ে রাজ্য ফিরে গেলেন। তিনি বারানসির রাজা হলেন। চন্দ্রকুমারকে করলেন উপরাজ। সূর্যকুমারকে দিলেন সেনাপতির পদ। রাক্ষসের জন্য সুন্দর ঘর ও সুন্দর ব্যবস্থা করলেন। এভাবে রাজধর্ম পালন করে তিনি পরলোক গমন করলেন। পুণ্যবলে মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গ লাভ করলেন।

উপদেশ : ধর্মপথে চললে জয় অনিবার্য।

অনুশীলনমূলক কাজ

রাজা কেন রানিকে বর দিতে চেয়েছিলেন?

বোধিসত্ত্ব রাক্ষসকে সৎপথে আনার জন্য কী বলেছিলেন?

পাঠ : ৫

পদ্ম জাতক

পুরাকালে বারানসিরাজ ব্রহ্মাদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব এক শ্রেষ্ঠপুত্রবৃপ্তে জন্মাই হয়ে আসেন। তখন নগরের অভ্যন্তরে একটি সরোবরে পদ্ম ফুটত। এক ব্যক্তি ঐ সরোবরের রক্ষণাবেক্ষণ করত। তার নাকটি কাটা ছিল।

একদিন বারানসিতে একটা উৎসবের সংবাদ প্রচারিত হলো। বৌধিসন্তুষ্ট তিনজন শ্রেষ্ঠীগুরু পঞ্চের মালা গলায় দিয়ে ছি উৎসবে যাবেন বলে মনস্থির করলেন। তাঁরা পঞ্চের লোভে সরোবরে গিয়ে হাজির হলেন।

পঞ্চরক্ষক তখন সরোবর থেকে পদ্ম তুলছিল। তাঁরা তিনজনে পঞ্চরক্ষকের প্রশংসা শুনু করলেন।

প্রথম শ্রেষ্ঠীগুরু বললেন, ‘চুল, দাঢ়ি যতবার কাটা হয় দুদিন পরে তা আবার আগের মতো বৃক্ষি পায়। তাই পঞ্চরক্ষক। তোমার খণ্ডিত নাকটিও চুল, দাঢ়ির মতো বৃক্ষি পেতে পেতে একসময় পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে। দয়া করে আমাকে কয়েকটি পদ্ম দাও না ভাই।’ একথা শুনে পঞ্চরক্ষক অত্যন্ত ঝুঁত হলো। সে তাঁকে কোনো পদ্ম দিল না।

দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠীগুরু বললেন, “শরৎকালে ক্ষেত্রে বীজ বুনলে সেই বীজ থেকে যেভাবে অঙ্গুর বের হয়, ঠিক সেভাবে তোমার খণ্ডিত নাকটিও একসময় পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। ভাই পঞ্চরক্ষক ! আমাকে কয়েকটি পদ্ম দাও না”। একথা শুনেও পঞ্চরক্ষক অত্যন্ত ঝুঁত হলো এবং তাঁকেও কোনো পদ্ম দিল না।

বৌধিসন্তুষ্টী তৃতীয় শ্রেষ্ঠীগুরু বললেন, ‘এগুলো সব মূর্ধের প্রলাপ। তুরা পঞ্চের লোভে মিথ্যা তোষামোদ করছে। কাটা নাক কখনো নতুন করে গজাবে না বা বৃক্ষি পাবে না। তোমাকে আমি সত্য কথাটাই বললাম। ভাই পঞ্চরক্ষক আমাকে গোটা কতক পদ্ম দাও’।

তৃতীয় শ্রেষ্ঠীগুরুর কথা শুনে পঞ্চসরোবরের রক্ষক খুশি হয়ে বলল, ‘এ দুজন মিথ্যাকথা বলেছে, মিথ্যা তোষামোদ করেছে। তুমি প্রকৃত সত্য কথাই বলেছ। অতএব পদ্ম তোমারই পাওয়া উচিত’।

পঞ্চরক্ষক তৃতীয় শ্রেষ্ঠীগুরুকে একটা বড় পঞ্চমালা দিয়ে পূর্ণস্তুত করলেন।



পঞ্চরক্ষক পদ্ম তুলছেন

২০ উপদেশ : চাটুকারিতার ফল কখনো ভালো হয় না।

অনুশীলনমূলক কাজ

পদ্মরঞ্জক তৃতীয় শ্রেষ্ঠীগুৱাকে পদ্ম দিয়েছিলেন কেন?

জাতকের গল্পটি পাঠ করে কী শিক্ষা পেলে? বর্ণনা কর।

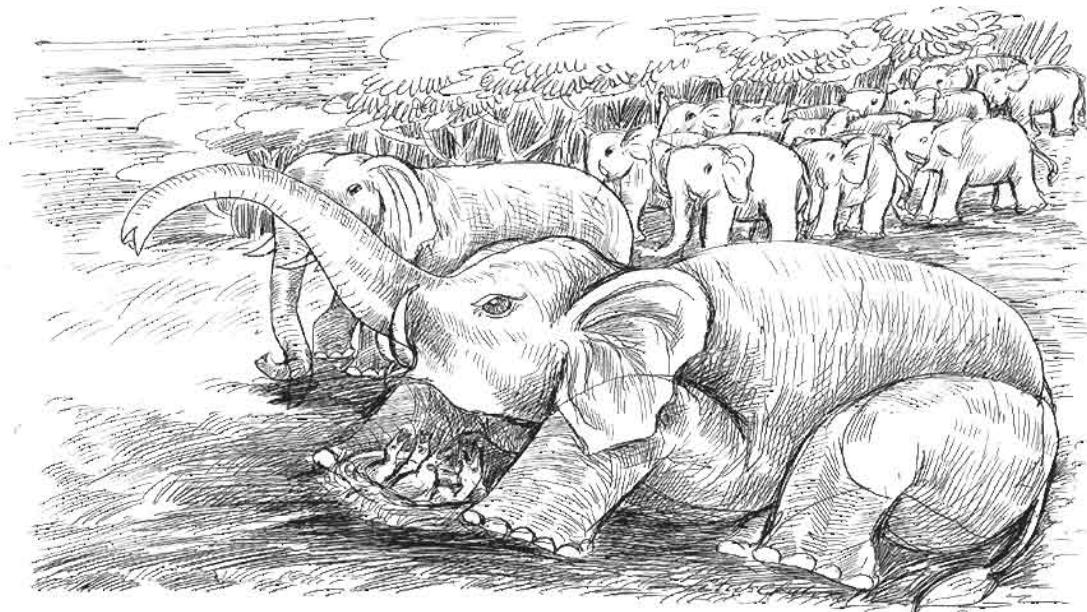
পাঠ : ৬

লটুকিক জাতক

পুরাকালে বৌদ্ধিসত্ত্ব হস্তীকুলে জন্মগ্রহণ করে আশি হাজার হাতির অধিপতি হয়েছিলেন। সে সময় এক লটুকিক পাখি হাতিদের বিচরণের স্থানে ডিম পেড়েছিল। সেই ডিম ফুটে একসময় ছানা বের হলো।

ছানাগুলোর তখনও পাখা গজায়নি, সেজন্য তারা উড়তে পারত না। এমন সময় বৌদ্ধিসত্ত্ব দলবলসহ সেই পথে এসে উপস্থিত হলেন। তখন মা লটুকিক পাখি তার ছানাদের জীবন বাঁচাবার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ল। সে ভাবল, হাতির পায়ের তলে পড়ে এই বুবি তার ছানাদের প্রাণ যায়।

কাজেই সে তার ছানাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য হস্তীরূপী বৌদ্ধিসত্ত্বের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে তার পাখা দুটি জোড় করে তার ছানাদের প্রাণরক্ষার জন্য বৌদ্ধিসত্ত্বের কাছে মিনতি জানাল। বলল, হে হস্তীরাজ, আপনার বয়স ষাট বছর, আপনি যশস্বী, পর্বতের ওপরের সমতল ভূমিতে বিচরণ করেন। আমার দুটি পাখা জোড় করে আপনাকে বন্দনা করছি। আমার দুর্বল ছানাগুলোকে মারবেন না। বৌদ্ধিসত্ত্ব বললেন, ‘হে লটুকিক পাখির মা ! তুমি ভয় পেও না। আমি তোমার ছানাদের রক্ষা করব’ – এই বলে তিনি ছানাগুলোকে পায়ের ফাঁকে আগলে রাখলেন। একে একে আশি হাজার হাতি চলে গেলে তিনি সরে দাঁড়ালেন। তারপর সেখান থেকে যাওয়ার সময় লটুকিক পাখির মাকে বললেন, আমাদের পিছনে একটি দলছাড়া হাতি আছে। সে একা। সে আমাদের কথা শোনে না, আমার আদেশও মানে না। কাজেই তুমি তার কাছে তোমার বাচ্চাদের বাঁচাবার জন্য প্রার্থনা করো। লটুকিক পাখি বৌদ্ধিসত্ত্বকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় জানাল। তারপর সেই দলছুট হাতিটি এলো। মা লটুকিক পাখি দুটি পাখা জোড় করে তার বাচ্চাদের জীবন রক্ষা করার জন্য বিনীত প্রার্থনা জানাল। বলল, হে একাচারী অরণ্যবাসী, যশস্বী হস্তীরাজ, আপনার বয়স ষাট বছর, পর্বতের ওপরে সমতল ভূমিতে আপনি বিচরণ করেন। আমার দুটি পাখা জোড় করে আপনাকে বন্দনা জানাচ্ছি। আমার দুর্বল ছানাগুলোকে আপনি মারবেন না। তখন সেই একাচারী হাতি বলল, লটুকিক পাখি, আমি তোমার বাচ্চাগুলো পায়ে পিঘে মারব। তুমি দুর্বল, তুমি আমার কী করতে পারবে? তোমার মতো শত শত লটুকিক পাখিকে আমার এই বাঁ পা দিয়ে শেষ করে দিতে পারি – এই বলে সে বাচ্চাগুলোকে পায়ে দলে পিঘে চিন্দকার করতে করতে চলে গেল।



বেথিসত্ত্বপী হষ্টীরাজ লটুকিক ছানাদের রক্ষা করছে

মা লটুকিক গাছের শাখায় বসে বলল, হে হষ্টীরাজ, তুমি আজ চিন্দকার করতে করতে ঘাছ যাও। কয়দিন পরে আমি তোমার কী করতে পারি তা বুবাবে। শরীরের শক্তি থেকে জানের বল যে শ্রেষ্ঠ তা তুমি জানো না। আমি তোমাকে উচিত শিক্ষা দেব।

তারপর লটুকিক পাখি এক কাকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল। কাক তার বন্ধুত্বে খুশি হয়ে বলল, বন্ধু! আমি তোমার কী উপকার করতে পারি? লটুকিক পাখি বলল, বন্ধু! তোমার সবু ঠোঁট দিয়ে একদিন এই একাচারী হাতির চোখ তুলে নিতে পারবে? কাক লটুকিক পাখির দৃঢ়ব্যের কাহিনি শুনে বলল, আচ্ছা।

তারপর লটুকিক এক নীল মাছির সঙ্গে বন্ধুত্ব করল। নীল মাছিও কাকের মতো লটুকিক পাখির দৃঢ়ব্যের কথা শুনে খুব কষ্ট পেল। লটুকিক পাখি বলল, ভাই, কাক যখন হাতির চোখ তুলে নেবে, তুমি তখন সেখানে ডিম পাড়বে। এই আমার অনুরোধ। এতে নীল মাছি রাজি হলো। তারপর লটুকিক এক ব্যাঙের কাছে গেল। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করল। ব্যাঙও লটুকিক পাখির সব কথা শুনল। তখন লটুকিক বলল, ভাই ব্যাঙ! একাচারী হাতি চোখের যত্নায় ছট্টফট করতে করতে পানি খাওয়ার জন্য এদিক সেদিক ছোটাছুটি করবে। তখন তুমি পাহাড়ের ওপর গিয়ে শব্দ করবে। হাতিটি তখন পাহাড়ে উঠবে। হাতিটি পাহাড়ে উঠলে তুমি নিচে নেমে শব্দ করবে। তখন হাতিটি পাহাড় থেকে নিচে নামতে চেষ্টা করবে। আর নিচে নামার সময় পা ফসকে গিরিখাতে পড়ে মরবে। এটুকু আমি তোমার কাছে চাই। ব্যাঙ তাতে রাজি হলো।

তারপর কাক হাতির চোখ দুটি তুলে নিল। নীল মাছি তাতে ডিম পাড়ল। হাতি চোখের যত্নায় অধিক হয়ে পানির ঝোঁজে ছোটাছুটি শুরু করল। ব্যাঙ পাহাড়ের ওপর গিয়ে ডাকতে শুরু করল। অনেক কষ্টে হাতি পাহাড়ের ওপর উঠল। তখন ব্যাঙ পাহাড়ের নিচে খাড়া গিরিখাতে গিয়ে ডাকতে শুরু করল। হাতিও সেখানে ছুটল কিন্তু ওপর থেকে নিচে নামার সময় অন্ধ একাচারী হাতি গিরিখাতে পড়ে প্রাণ হারাল।

এভাবে লটুকিক পাখি বুদ্ধি দ্বারা বিশাল হাতিকে পরাজিত করে।

সেই একাচারী হাতি ছিল দেবদত্ত।

উপদেশ : দেহবলের চেয়ে জ্ঞানবল বড়।

পাঠ : ৭

মিত্রামিত্র জাতক

পুরাকালে বারানসিতে ব্রহ্মদত্ত রাজত্ব করতেন। সে সময় বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমে তাঁর বয়স বাড়ল। যৌবনে পদার্পন করলে মাতাপিতা তাঁকে সৎসারে আবদ্ধ করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর বিবাগী মন আকৃষ্ট হলো না। তিনি খুবি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। সাধনা করে তিনি পূর্বসূতিজ্ঞান ও ধ্যানমার্গ ফল লাভ করলেন।

তাঁর অনেক শিষ্য ছিল। তিনি তাদের নিয়ে হিমবন্ত প্রদেশে ধ্যান সাধনা করে জীবনযাপন করতেন। তাঁর শিষ্যদের একজন মাতৃহীন এক হস্তীশাবক লালন পালন করত। গুরু তাকে হাতির বাচ্চা না পোষার জন্য বারবার নিষেধ করেছিলেন। কারণ হিংস্র প্রাণীকে বিশ্বাস করতে নেই। সুযোগ পেলেই তারা ছোবল মারে।

হস্তীশাবক ক্রমে বড় হলো। খাদ্য আহরণে বনে বনে ঘুরে বেড়াত। সম্ম্যায় ফিরে আসত। একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে সে পালককে হত্যা করে বনে পালিয়ে গেল। সেই যে গেল আর ফিরে এলো না।

অন্য খুবিরা হস্তীশাবক পালকের মৃতদেহ দাহ করে বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘গুরু! মিত্রভাব ও শত্রুভাব নির্ণয় করার উপায় কী?’

বোধিসত্ত্ব উভরে বললেন, ‘যে দেখা করতে এসে হাসে না। অভিনন্দনের সাড়া দেয় না। মুখ ফিরিয়ে রাখে। বলে এক, করে অন্য। এরূপ ব্যক্তিই শত্রুভাবাপন্ন।’

আর যে উপকার করে। মঞ্জল কামনা করে। মিষ্টভাষী হয়। দুর্দিনে সাহায্য করে। সে সুমিত্র নামে কথিত। যিনি অমিত্রের উক্ত দোষগুলো এবং মিত্রের গুণগুলো দেখে শুনে কাজ করেন তিনিই বুদ্ধিমান।

বোধিসত্ত্ব এরূপে মিত্র ও অমিত্রের স্বভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করলেন। শিষ্যদের সত্যপথে চলতে উদ্বৃদ্ধ করলেন।

উপদেশ : মিত্র-অমিত্র নির্বাচনই বুদ্ধিমানের কাজ।

অনুশীলনমূলক কাজ

মিত্র এবং অমিত্র কীভাবে চেনা যায় লেখ (দলীয় কাজ)।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. বৌদ্ধধর্ম অনুসারে এক জন্মের কেউ বুদ্ধ হতে পারেন না।
২. প্রত্যেক জাতকের অংশ আছে।
৩. কুমির যখন মুখ হাঁ করে তখন তার কিছুই দেখতে পায় না।
৪. সেই সরোবরে এক থাকত।
৫. হন্তীশাবক ক্রমে হলো।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কততম জন্মে বোধিসত্ত্ব বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হন?
২. বানরেন্দ্র জাতকে কুমিরের অস্তঃসত্ত্ব স্তৰীর সাথ কী ছিল?
৩. মহিংসাস কুমাররা কয় ভাই ছিলেন? তাদের নাম কী ছিল?
৪. মিত্রামিত্র জাতকে বুদ্ধিমান কে?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বৌদ্ধধর্মে জাতক পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যা জান লিখ।
২. পন্থ জাতক কাহিনির মূল শিক্ষা কী? আলোচনা কর।
৩. ‘মিত্রামিত্র জাতক’ অবলম্বনে মিত্র ও শত্রুর প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জাতকের কয়টি অংশ ?

ক. ২টি	খ. ৩টি
গ. ৪টি	ঘ. ৫টি
২. সত্য, ধৈর্য, ত্যাগ আর বিচক্ষণতা কোন জাতকের মর্মকথা ?

ক. দেবধর্ম জাতক	খ. মিত্রামিত্র জাতক
গ. বানরেন্দ্র জাতক	ঘ. লটুকিক জাতক

নিচের উদ্দীপকটি পড় ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বিনোদ চাকমা এক অত্যাচারী শাসকের বেতনভুক্ত কর্মচারী। উক্ত শাসক হামে যেকোনো ধরনের অপরাধী লোকদের ধরে এনে কঠিন শান্তি ও অনাহারে রাখার আদেশ দিতেন। কিন্তু বিনোদ চাকমা সত্য ও ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন। তাই শাসকের অগোচরে কম শান্তি দিয়ে আহারের ব্যবস্থা করতেন। এভাবে কর্মজীবন শেষ করে সজ্ঞানে মৃত্যবরণ করেন।

৩. বিনোদ চাকমা জাতকের দৃষ্টিতে কোন ধরনের লোক ছিলেন ?

ক. দেবধর্ম পরায়ণ	খ. রাজ ধর্ম পরায়ণ
গ. ব্রাহ্মণ ধর্ম পরায়ণ	ঘ. লোক ধর্ম পরায়ণ

৪. উক্ত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিনোদ চাকমা সাভ করতে পারেন -
 - i. স্বর্গকূল
 - ii. ব্রহ্মকূল
 - iii. দেবকূল

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

- ১। একদা এক বনে এক যক্ষ বাস করত। সে বিভিন্ন রূপ ধরে মানুষের বুদ্ধির পরীক্ষা করত। একদিন সে বনবাসী মানুষ সেজে বোধিসত্ত্বের সামনে এসে বলল, ‘ভাই, আপনি দুর্বল ও ক্লান্ত। সামনে পরিক্ষার টলমলে জলাশয়। ইচ্ছে করলে এই জলাশয়ে নিজেকে ধোত করে আপনি ক্লান্তি দূর করতে পারেন।’ বনবাসীর চালাকি বুঝতে পেরে বোধিসত্ত্ব তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন।
 - ক. জাতক প্রধানত কয়টি অংশে বিভক্ত ?

খ. জাতক পাঠের অন্যতম প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।	গ. উদ্দীপকের কাহিনি কোন্ জাতকের সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার মর্মার্থ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।	

২. ঘটনা : ১

এক চোখ টেরা বৃদ্ধ মহিলা পাকা আমের ঝুঁড়ি নিয়ে বাগানের ধারে বসে ছিল। রীমা, সীমা এবং ঝুমা চাকমারা ঐ পথে খাওয়ার সময় উক্ত বৃদ্ধার সাথে দেখা হলো। বৃদ্ধার আমের ঝুঁড়ি দেখে তাদের আম খাওয়ার লোভ হলো। রীমা ও সীমা বৃদ্ধার চোখের সৌন্দর্য বিভিন্নভাবে বর্ণনা করল। কিন্তু বৃদ্ধা রাগার্বিত হয়ে দুজনকে কোনো আম দিল না। ঝুমা বৃদ্ধার টেরা চোখ সম্পর্কে কর্মফলের আসল কথা বুঝিয়ে বললে বৃদ্ধা খুশি হয় এবং ঝুমাকে আম প্রদান করে।

ঘটনা : ২

জয়ন্ত চাকমা একটি সাপ পুষে বড় করল। সে সাপটিকে বাঁশের চোঙার ভেতর রেখে দুই-একদিনের জন্য বাড়ির বাইরে যায়। বাড়ি ফিরে সাপটিকে খাওয়াতে গেলে সাপটির ছোবলে জয়ন্ত চাকমার মৃত্যু ঘটে।

- ক. দেবধর্ম জাতকে বোধিসত্ত্বের নাম কী ছিল ?
- খ. তিনি রাজপুত্র রাজপ্রাসাদ থেকে কেন বেরিয়ে পড়ল? বর্ণনা কর।
- গ. ঘটনা-২ এর সাথে কোন জাতকের মিল রয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘চাটুকারিতার ফল কখনো ভালো হয় না’-পদ্ম জাতকের উপদেশ বাণীটি ঘটনা-১ এর সঙ্গে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ-ব্যাখ্যা কর।

দশম অধ্যায়

বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান

বুদ্ধ, বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য, উপাসক-উপাসিকা, রাজন্যবর্গ এবং পণ্ডিত ভিক্ষুদের স্মৃতিবিজড়িত অনেক স্থান, বিহার এবং চৈত্য আছে। যেগুলো বৌদ্ধ ঐতিহ্য এবং দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এসব ঐতিহ্য এবং দর্শনীয় স্থানসমূহ ছড়িয়ে আছে। তারমধ্যে অনেকগুলোই ভারতে অবস্থিত। এ অধ্যায়ে আমরা নালন্দা, রাজগুহ, শ্রাবণ্তী, তক্ষশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- * ঐতিহাসিক বৌদ্ধ তীর্থ ও দর্শনীয় স্থানসমূহের বর্ণনা দিতে পারব।
- * বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও স্থানসমূহ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- * বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানসমূহের ধর্মীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ : ১

ঐতিহাসিক বৌদ্ধ তীর্থ ও দর্শনীয় স্থানের পরিচিতি

সিদ্ধার্থ গৌতম ছয় বছর কঠোর সাধনা করে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বুদ্ধত্ব লাভ করে তিনি সর্বপ্রাণীর দুঃখমুক্তি ও কল্যাণের জন্য সুদীর্ঘ পঁয়তালিশ বছর ধর্ম প্রচার করেন। ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি অনেক স্থানে গমন করেন। তাঁর নির্দেশে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরাও নানা স্থানে বুদ্ধবাণী ছড়িয়ে দেন। বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিহার, চৈত্য, সংঘারাম, স্তুত, স্তুপ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। কালক্রমে তাঁদের স্মৃতিবিজড়িত এসব স্থান বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানের মর্যাদা লাভ করে। বৌদ্ধদের নিকট এসব স্থান তীর্থস্থান হিসেবে শ্রদ্ধা লাভ করে। তীর্থস্থান ভ্রমণে পুণ্য হয়। তাই বৌদ্ধরা শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এসব স্থান ভ্রমণ করেন। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশে এরূপ অনেক বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান আছে। ভারতে অবস্থিত বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশিনারা, রাজগুহ, শ্রাবণ্তী, বৈশালী, নালন্দা, বিক্রমশীলা, কপিলাবস্তু, সাঁচীস্তুপ, অজন্তা, ইলোরা, উদয়গিরি, রত্নগিরি ইত্যাদি। পাকিস্তানে অবস্থিত স্থানসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো: পুরুষপুর (পেশোয়ার) ও তক্ষশীলা। আফগানিস্তানে অবস্থিত স্থানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : গান্ধার ও বামিয়ান। বাংলাদেশে অবস্থিত দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ময়নামতির শালবন বিহার, আনন্দবিহার, ত্রিরত্ন মূড়া বিহার, কোটিলা মূড়া বিহার, রূপবান মূড়া বিহার, পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার, ভাসু বিহার, হলুদ বিহার, মহাস্থানগড় ইত্যাদি।

ওপরে বর্ণিত স্থানগুলোর অনেক স্থানে বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যগণ বসবাস করতেন। ধ্যান-সমাধি করতেন। বর্ষাবাস যাপন করতেন। ধর্মোপদেশ দান করতেন। ধর্ম-দর্শন চর্চা করতেন। তাঁদের ধর্মদেশনা শুনে অনেক লোক লোভ-ধ্বেষ-মোহ ক্ষয় করে দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করেছেন। নির্বাণ সুখ উপভোগ করেছেন। আবার অনেক স্থানে বুদ্ধ

বা তাঁর প্রধান শিষ্যগণ গমন করেননি। কিন্তু বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন চর্চার কেন্দ্র হিসেবে সেগুলোও প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাই এসব স্থানের ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম।

এসব স্থান পরিভ্রমণ করলে বুদ্ধের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানা যায়। তোগোলিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। মনে ধর্মীয় ভাব জাগ্রত হয়। ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনযাপনে উৎসাহ সৃষ্টি হয়। জনহিতকর এবং কুশলকর্ম সম্পাদনে মন উদ্বৃদ্ধ হয়। ধর্মচর্চায় প্রেরণা লাভ করা যায়। মন পবিত্র হয়। কলুষমুক্ত হয়। তৎক্ষণাৎ, লোক-দ্বেষ-মোহ প্রভৃতি ক্ষয় হয়। ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ বাড়ে। দেশপ্রেম সৃষ্টি হয়। তাই তীর্থ ও দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

পরবর্তী পাঠে আমরা চারটি বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে জানব।

অনুশীলনমূলক কাজ

দেশ অনুযায়ী বৌদ্ধ দর্শনীয় স্থানগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ২

নালন্দা

নালন্দা ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা জেলার অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে নালন্দা একটি স্বতন্ত্র জেলা। গৌতম বুদ্ধ অনেকবার নালন্দায় এসেছিলেন। তিনি এখানে শ্রেষ্ঠীপুত্র পাবারিকের আম বাগানে অবস্থানকালে তাঁর শিষ্যদের ধর্ম দেশনা করেছেন। এখানে অনেক ধনী ব্যক্তি বসবাস করতেন। কয়েকজন ধার্মিক ও ধনী ব্যক্তি ভূসম্পত্তি ক্রয় করে বুদ্ধকে দান করেন। নালন্দা ছিল একটি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী মহানগরী।

নালন্দা নামের উৎপত্তি নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তার মধ্যে দুটি ব্যাখ্যা প্রধান। একটি হলো, অতীতকালে এখানে বোধিসত্ত্ব নামে এক ব্যক্তি রাজত্ব করতেন। তিনি কখনো কাউকে ‘নালন্দা’ অর্থাৎ ‘আমি দেব না’ একথা বলতে পারতেন না। সে কারণে এ স্থানের নাম হয় নালন্দা। আরেকটি ব্যাখ্যা হলো, স্থানীয় এক আম বাগানের মধ্যস্থলে একটি পুকুর ছিল। সেখানে নালন্দা নামক এক নাগরাজ বাস করতেন। তার নাম অনুসারে এ জায়গার নাম হয় নালন্দা।

জানা যায় গৌতম বুদ্ধের অঞ্চলিক সারিপুত্রের জন্ম হয়েছিল এই নালন্দায়। পরবর্তীকালে সম্বাট অশোক অঞ্চলিকের স্মরণে এখানে একটি সুবৃহৎ সংঘারাম নির্মাণ করেছিলেন। সেটি নালন্দা মহাবিহার নামে খ্যাত হয়। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে বিখ্যাত বৌদ্ধ পন্ডিত ও দার্শনিক নাগার্জুন নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিহারটিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে গড়ে উঠে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। অনুমান করা হয়, খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের পর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে ছোট ছোট বিহার, চৈত্য, স্তুপ ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এ সকল স্থাপনার সমন্বয়ে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল জগৎ বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়।



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্রঃসন্তুপ

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, কলোজের রাজা হর্ষবর্ধন ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য এখানকার হামের সমুদয় কর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছিলেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নালন্দায় আসেন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তম শতকের প্রথমার্থ পর্বত্ত অবস্থান করেন এবং জ্ঞানার্জনের জন্য অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। বাংলার কৃতী সন্তান মহাপঞ্জিত ভিক্ষু শীলভদ্র তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। বাংলার শাস্ত্ররক্ষিত ও অতীশ দীপঙ্করও একসময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম-দর্শন চর্চার প্রাপকেন্দ্র ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে এখানে ‘ধর্মগঞ্জ’ নামে একটি বিরাট পাঠাগার ছিল। পাঠাগারে ছিল মূল্যবান অনেক পাঞ্জুলিপি ও গ্রন্থ। বাংলার পাল রাজাদের আমলে নালন্দার খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা বিহারের ব্যয় ও শিক্ষা কেন্দ্রের সম্মুক্তির উদ্দেশ্যে বহু অর্থ ও জমি দান করেন। রাজা ধর্মপাল সবচেয়ে বেশি পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তখনকার দিনে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়া গৌরবের বিষয় ছিল। এ বিদ্যাপীঠের পাঠ্যক্রমের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বৌদ্ধ, বৈদিক ও ব্রাহ্মণ বিষয়ক সাহিত্য, দর্শন, অলঙ্কার শাস্ত্র, ব্যাকরণ শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি। এ ছাড়া সাধারণ জ্ঞানের নানা বিষয়ও ছিল। এ পাঠ্যক্রমের অনুসারী ছাত্ররা নিয়মানুবর্তীতা, শিষ্টাচার, গভীর পাণ্ডিত্য ও আদর্শগত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অবয়ব আর নেই। সব কিছু আজ ধ্রঃসন্তুপে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে সে ধ্রঃসাবশেষের নির্দর্শনগুলো স্থানক্ষিত আছে। ভারতের বিহার রাজ্যের সরকার বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও

গবেষণার জন্য বর্তমানে ‘নব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়’ নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃপরেখা অনুসরণ করে এটি নির্মিত হয়েছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

নালন্দা কোথায় অবস্থিত? নালন্দা নামের উৎপত্তি ব্যাখ্যা কর।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য অধ্যক্ষের নাম লেখ।

পাঠ : ৩

রাজগৃহ

রাজগৃহ ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা জেলায় অবস্থিত। এটি ছিল মগধ রাজ্যের রাজধানী। প্রাচীনকালে এটি বসুমতী, কুশাঘপুর, গিরিবজ্র ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে এটি রাজগীর নামে খ্যাত। চারদিকে পাহাড়বেষ্টিত স্থানটি দেখতে অতি মনোরম।

গৌতম বুদ্ধ রাজগৃহে ধর্মপ্রচার করতে এসেছিলেন। তখন মগধ রাজ্যের রাজা ছিলেন বিষ্ণুর। বুদ্ধের ধর্মদেশনা শ্রবণ করে রাজা বিষ্ণুর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। রাজা বিষ্ণুর এবং তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর সময়কালে এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিল।

রাজা বিষ্ণুর বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের বসবাসের জন্য ‘বেলুবনারাম’ বা সংক্ষেপে বেগুবন বিহার দান করেন। এটি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে প্রথম বিহার দান। বুদ্ধ এ বিহারে অবস্থানকালে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন সংঘে যোগদান করেছিলেন। রাজা বিষ্ণুর অনুরোধে বুদ্ধ এখানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রথম উপোসথ পালনের অনুমতি প্রদান করেন। তগবান বুদ্ধ বেগুবন বিহারে সাত বর্ষাবাস অতিবাহিত করেন। রাজগৃহে ছিল জীবকের বিশাল আম বাগান। জীবক ছিলেন চিকিৎসক এবং বুদ্ধের পরম ভক্ত। জীবক তাঁর আম বাগানটি বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের দান করেন। এই আমবাগানে যে বিহারটি গড়ে ওঠে তার নাম ছিল ‘জীবকারাম বিহার’। বিহারে অবস্থানকালে বুদ্ধ রাজা অজাতশত্রুকে উদ্দেশ্য করে ‘শ্রামণ্যফল সূত্র’ দেশনা করেন।

এখানে ছোট-বড় বেশ কয়েকটি গুহা আছে। তার মধ্যে ‘সঙ্গপর্ণী’ গুহা অন্যতম। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ পূর্ণ প্রাণ্ডির তিন মাস পর মহাকশ্যপ স্থবির রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গপর্ণী গুহায় প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির ২২ অধিবেশন আহ্বান করেন। এ সঙ্গীতিতে উপালি স্থবির ‘বিনয়’ এবং আনন্দ স্থবির ‘ধর্ম’ ব্যাখ্যা করেন।



সংগৃহী পুষ্টি

পথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের পর হৌর্য সন্তুষ্ট অশোক এখানে একটি 'জগ' প্রতিষ্ঠা করেন। জগের শীর্ষে হিল হতীর প্রতির তাকর্য। অশোক এখানে একটি সুগও নির্মাণ করেন বলে জানা যায়।

রাজগৃহ ভগবান বুদ্ধের জীবনের অন্যতম স্মৃতিবিজড়িত স্থান। তাই রাজগৃহ বৌদ্ধদের কাছে অতি গবিন্য জীবন্তভূমি।

অনুশীলনযুদ্ধক কাজ

রাজগৃহ কোথায় অবস্থিত এবং কী কী নামে পরিচিত হিল?

পথম সঙ্গীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

পাঠ : ৪

শ্রাবণী

শ্রাবণী আচিন কোশল রাজ্যের রাজধানী হিল। বুদ্ধের সমরকালে কোশল রাজ্যের রাজা হিলেন প্রসেনজিঙ্ক। তিনি বুদ্ধের প্রতির প্রতির তন্ত্র হিলেন। বৌদ্ধধর্মের ধাচাৰ-প্রসারে তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। তিনি রাজাকারাম বিহার নির্মাণ করে সুব্রহ্মকে দান করেছিলেন। রাজা প্রসেনজিঙ্ক বিহারটি রাখি শশিকামেবীর অনুরোধে নির্মাণ করেছিলেন। এটি 'শশিকারাম' নামেও পরিচিত হিল। শ্রাবণীর বর্তমান নাম সাহেত-মাহেত। এটি বর্তমানে উত্তর ভারতের পোতো জেলার অবস্থিত।

আচিনকালে শ্রাবণী উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপদ এবং ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম প্রাণকেন্দ্ৰ হিল। এখানে অনেক প্রেষ্ঠী (ধনী ব্যক্তি) বাস কৰতেন। প্রেষ্ঠী সুস্থ বুদ্ধের সমরকালে শ্রাবণীর প্রেষ্ঠ ধনী হিলেন। তিনি বুদ্ধকে গাতীরভাবে ধন্যা কৰতেন। বুদ্ধের বসবাসের জন্য তিনি শ্রাবণীতে বিশ্বাত জেতবন বিহার

নির্মাণ করেন। জ্ঞেতবন বিহার নির্মাণের অন্ত জারিগাটি ঘৰেছিলেন বুদ্ধের অংগীকৃত সারিপুত্র।

এটি হিল জেত গ্রামকুমারের উদ্যান। এটি বিহুর করতে রাজি দা হলে সুর্যজন্ম প্রষ্ঠী সুদূর জমির আবতসের সমপরিমাণ বর্ষমূলা ছড়িয়ে দিয়ে স্থানটি কুর করেন এবং সেখানে জ্ঞেতবন বিহার নির্মাণ করেন। এ বিহারে ডিকুদের বসবাসের জন্য শয়ন কক্ষ, প্রার্থনা কক্ষ, রামায়ণ, মানবর, পৌচাপার, পুরুষ, কৃপ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপি হিল। জ্ঞেত গ্রামকুমার বিহারের তোরণ নির্মাণ করে দেন। পরবর্তীকালে তোরণের পাশে সন্তুষ্টি অশোক উচ্চ উচ্চ নির্মাণ করেন। প্রষ্ঠী সুদূর ছিলেন দানবীর। সময় আবতবর্ষে তাঁর দানকার্যের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি অনাধিক পিঙ্ক দানা ছিলেন বলে ‘অনাধিপিঙ্কিত’ নামে খ্যাত হন। জ্ঞেতবন বিহারের চারদিকে শুভ্র পাহাড়া হিল। পরিবেশ হিল খান সাধনার অনুকূল। তাই বুধ এই বিহার খুব শহজ করতেন। তিনি এখানে উনিশ বর্ষাবাস পালন করেন। দন্ত অঙ্গুলিমালকে বুধ জ্ঞেতবন বিহারে দীক্ষা দান করেছিলেন।

কালের গতে জ্ঞেতবন বিহারটি হারিয়ে যাব। শক্ত শক্তকের শথম দিকে পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ধর্ম প্রাবল্যাতে এসেছিলেন তখন তিনি অবস্থায় বিহারটি দেখতে পান। সক্ষম শক্তকের দিকে পরিব্রাজক হিউয়েন সান প্রাবল্যাতে এসেছিলেন। তখন তিনি বিহারের ধর্মস্থাপ তিতিকুমি ছাড়া কিছুই দেখেননি। তারপর সরকার ১৯৯১ সালে এ স্থানে ধর্মস্থাপ পরিচালনা করে অনেক প্রস্তাবিক মিসর্ন উচ্চায় করেন।



প্রাচীন

মিগার মাতা বিশাখা প্রাবল্যাতে ‘পূর্বীরাম বিহার’ নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেছিলেন। এ বিহারটি হিল পিতল বিশিষ্ট। বুধ প্রাবল্যাতে বসবাস করে অনেক ধর্মীয়দেশ দান করেছেন। তিনি এখানে অনেক শুরুতশূর্ণ স্মৃতি দেশনা করেছেন যা প্রিপিটকে পাওয়া যাব। প্রাবল্যাতে বুদ্ধের স্বচচের বেশি অনুসারী হিলেন। প্রাবল্যাতে বুদ্ধের চীবন ও কর্মের অনেক স্মৃতি বিজড়িত আছে। তাই এ স্থান বৌদ্ধদের কাছে অতি শক্তি ভীরু ও দর্শনীয় স্থান।

২৪

অনুশীলনমূলক কাজ

প্রাবল্যাতে বিখ্যাত বিহারগুলোর নাম উত্তোলন সেশনে কে কে নির্মাণ করেছিলেন বর্ণনা কর।

পাঠ : ৫

তক্ষশীলা

তক্ষশীলা পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি প্রদেশের উজ্জ্বল-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত। এটি হিন্দ গঙ্গার রাজ্যের রাজধানী। প্রাইর্ব জুনীর শতকে রাজকুমার আশোক পিতা সন্তাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হয়ে তক্ষশীলা পাসন করতেন। এখানে তিনি অনেক সংস্কার নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর সমরে এখানে অনেক ভূগুণ ও জুড়ও নির্মাণ করা হয়েছিল।

তক্ষশীলা হিল তখন জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। অনেক জ্ঞাতক কাহিনিতে শিক্ষার অন্যতম অধ্যান কেন্দ্র হিসেবে তক্ষশীলার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধবুঝে তক্ষশীলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিল। কোশলরাজ ধনেনজিৎ, পিতৃবী প্রথান মহান্তি, মন্ত্রবাজপ্যুর বন্ধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। আরও জ্ঞান যারা যারা, অবঙ্গীর ধর্মগ্রাল, অভ্যাসগ্রাম, চিকিৎসক জীবক, কাশীতুরাজ এবং যশোদত্তের যতো বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।



তক্ষশীলা

দেশ বিদেশ থেকে বহু শিক্ষার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য আসতেন। এখানে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হতো। এ অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে ধনুর্বিদ্যা ও ভেবজবিদ্যা হিল অন্যতম। প্রাইর্ব জুনীর শতকে চীনা পরিদ্রাজ্ঞক হিউরেন সান্ত বখন তক্ষশীলার আসেন তখন এর চতুর্দিকের পরিধি হিল ঘোর চারশ

মাইল। তিনি এখানে অনেকগুলো সংঘারাম দেখতে পেয়েছিলেন। তখন সেগুলোর প্রায়ই ছিল জনশূন্য ও ধৰ্মসপ্রাণ। তবে কিছু সংঘারামে তিনি অল্পসংখ্যক মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখতে পান। ‘হুন’ জাতির আকৃমণে এ নগরটি ধৰ্মসপ্রাণ হয়।

খননকাজের ফলে এখানে বৌদ্ধযুগের বহু স্তুপ ও বিহারের নির্দশন পাওয়া গেছে। প্রাচীনকালের অনেক মুদ্রা ও পাওয়া গেছে। পাকিস্তান সরকার এগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

অনুশীলনমূলক কাজ তঙ্গশীলা কোথায় অবস্থিত এবং কেন বিখ্যাত ছিল?

পাঠ : ৬

দর্শনীয় স্থান সংরক্ষণের উপায়

দর্শনীয় স্থানসমূহ দেশের অতীত গৌরবের স্বাক্ষর বহন করে। এগুলো বহির্বিশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে। এ ছাড়া এগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় রাজস্বও আয় হয়। তাই এগুলো মহামূল্যবান রাষ্ট্রীয় সম্পদ। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ সংরক্ষণ করার দায়িত্ব সকলের। নানা কারণে এসব স্থানের ক্ষতি হতে পারে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : প্রাক্তিক দুর্ঘ্য, চোর বা ডাকাত কর্তৃক লুষ্টন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দর্শনার্থীর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, পশু-পাখির মল ত্যাগ এবং কীটপতঙ্গের আক্রমণ প্রভৃতি। এসব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা আবশ্যিক। বিশেষ করে পরিকার-পরিচ্ছন্নতা, নিয়মিত যত্ন নেওয়া, সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা, পশু-পাখির প্রবেশ রোধ, দর্শনীয় স্থানের নিয়ম-নীতি মেনে চলা, পবিত্রতা রক্ষা করা, মমত্ববোধ এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনই পারে ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানসমূহকে ধৰ্মসের হাত থেকে রক্ষা করতে। এভাবে এসব গুরুত্বপূর্ণ স্থান সংরক্ষণের প্রতি সকলের যত্নশীল হওয়া উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ কী কী কারণে দর্শনীয় স্থান ধৰ্ম হতে পারে? দর্শনীয় স্থান সংরক্ষণের উপায়গুলো কী?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. তীর্থস্থান ভ্রমণে হয়।
২. এসব স্থান পরিভ্রমণ করলে বুদ্ধের জীবন ও সম্পর্কে জানা যায়।
৩. বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন চর্চার নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪. রাজগৃহে ছিল জীবকের বিশাল।
৫. সপ্তম শতকের দিকে পরিব্রাজক শ্রাবণীতে এসেছিলেন।

মিলকরণ

বাম	ডান
১. দর্শনীয় স্থানসমূহ দেশের অতীত গৌরবের	রাজধানী ছিল
২. উপালি স্থবির ‘বিনয়’ এবং আনন্দ স্থবির	মহানগরী
৩. শ্রাবণ্তী প্রাচীন কোশল রাজ্যের	স্বাক্ষর বহন করে
৪. তক্ষশীলা ছিল তখন জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চার	‘ধর্ম’ ব্যাখ্যা করেন
৫. নালন্দা ছিল একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী	প্রাণকেন্দ্র

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দর্শনীয় স্থান দর্শনে কী লাভ হয়?
২. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে উল্লেখযোগ্য বিষয় কী কী ছিল?
৩. শ্রেষ্ঠী সুদূর কেন অনাথপিণ্ডিক নামে খ্যাত হন?
৪. তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থীর নাম লেখ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বৌদ্ধধর্মে তীর্থস্থান সমূহের ধর্মীয় গুরুত্ব বর্ণনা কর।
২. বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে রাজা বিষিসারের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
৩. নালন্দা নামের উৎপত্তি কীভাবে হয় তা বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গৌতম বুদ্ধ কত বছর ধর্ম প্রচার করেছিলেন?
 - ক. ৩৫ বছর
 - খ. ৪৫ বছর
 - গ. ৫০ বছর
 - ঘ. ৬৫ বছর
২. তীর্থস্থান ভ্রমণের মাধ্যমে –
 - i. বিনোদনে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়
 - ii. ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন গঠন করা যায়
 - iii. ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞান অর্জিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. i ও ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দিপক্টি পড় ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

দীঁঙ্গ তাঁর বাবার সাথে একসময় একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে বেড়াতে যান। সেখানে তার বাবা দীঁঙ্গকে প্রাচীন স্কুল কলেজের ভগ্নাবশেষ দেখান এবং বিখ্যাত জ্ঞানী-গুণী ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন, কোনো এক সময় ‘হুন’ জাতির আক্রমণে এ নগরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৩. উদ্দিপকে বর্ণিত তীর্থস্থানটি কোনটির ইঙ্গিত বহন করে ?

ক. রাজগংহ

খ. তঙ্গনশীলা

গ. শ্রাবণ্তী

ঘ. সারনাথ

৪. উক্ত তীর্থস্থান ভ্রমণের মাধ্যমে দীঁঙ্গের শিক্ষণীয় দিক হচ্ছে -

i. প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করা

ii. প্রাচীন জ্ঞান-চর্চা সম্পর্কে অবহিত হওয়া

iii. বৌদ্ধ শিল্পকলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. i ও ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রীতম তার দাদুর সঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান দেখতে যায়। তাঁরা তীর্থস্থানের ভিতরে একটা বাগান দেখতে পান। ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য শয়নকক্ষ, স্নানঘর, প্রার্থনাকক্ষ ইত্যাদিও নজরে পড়ে। এ ছাড়া আরও দেখতে পান সন্তুষ্ট অশোকের একটি উঁচু স্তম্ভ। উক্ত বিহারের সামগ্রীক পরিবেশ ছিল ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার অনুকূলে। তা সত্ত্বেও তীর্থস্থানটি ধ্বংসপ্রাপ্ত দেখে প্রীতমের মনে অনুশোচনা হয়। এতে প্রীতমের দাদু বলেন এসব তীর্থস্থান রাষ্ট্রীয় সম্পদ এবং এগুলোর সংরক্ষণের দায়িত্ব সকলের।

ক. সন্তুষ্ট অশোক নির্মিত স্তম্ভের মধ্যে শীর্ষ স্তম্ভ কোনটি ?

খ. তীর্থস্থান ভ্রমণে পুণ্য হয় কথাটি ব্যাখ্যা কর ?

গ. প্রীতমের বর্ণনার মধ্যে কোন তীর্থস্থানের চিত্র ফুটে উঠেছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রীতমের দাদু কেন তীর্থস্থানগুলোর সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন ?

পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর।

- ২। শিক্ষক অমল বড়ুয়া কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে ভারতে শিক্ষা সফরে গেলেন। তাঁরা প্রথমে এমন একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন করলেন যাতে বুদ্ধ, বৈদিক ও ব্রাহ্মণ বিষয়ক সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতো। এমন কি পাঠ্যক্রম অনুসারে এখানকার শিক্ষার্থীরা নিয়মানুবর্তীতা, শিষ্টাচার ও পাদিত্য অর্জন করে দেশে-বিদেশে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন। দ্বিতীয় দিনে তারা প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের স্থানটি দর্শন করেন এবং কী কারণে সঙ্গীতি হয়েছে তা জানতে পারলেন।

ক. তক্ষশীলা কোন রাজ্যের রাজধানী?

খ. শ্রেষ্ঠী সুদত্তকে ‘অনাথপিণ্ডিক’ নামে ডাকা হয় কেন ?

গ. শিক্ষার্থীদের প্রথম দিনের দর্শনীয় স্থান কোনটি ? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় দিনের দর্শনীয় স্থানটি রাজগৃহের পরিচয় বহন করে-ব্যাখ্যা কর।

একাদশ অধ্যায়

বৌদ্ধধর্মে রাজন্যবর্গের অবদান: সম্রাট অশোক

অশোক ভারতবর্ষের বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন। তিনি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৮ অব্দ থেকে ২৩২ অব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন। ভারতবর্ষ এবং বহির্বিশ্বে তাঁর অপরিসীম প্রভাব ছিল। তাঁর রাজ্যসীমা-পশ্চিম দিকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান পর্যন্ত, পূর্ব দিকে বাংলাদেশ ও আসাম এবং উত্তর-দক্ষিণ দিকে কেরালা ও অন্ধ্র প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি কলিঙ্গ রাজ্যও জয় করেন। তাঁর রাজধানী ছিল মগধ। মগধ বর্তমানে ভারতের বিহার রাজ্যে অবস্থিত। কলিঙ্গ যুদ্ধের বিভীষিকা দেখে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে তিনি অপরিসীম অবদান রাখেন। অহিংসা, ভালোবাসা, সত্য, ন্যায় ও সহিষ্ণুতা ছিল তাঁর আদর্শ। শান্তিকামী এবং ধার্মিক রাজা হিসেবে তাঁর খুবই সুখ্যাতি ছিল। ধর্ম ও ন্যায়ের সঙ্গে তিনি রাজ্য শাসন করতেন। জনহিতৈষী শাসন ব্যবস্থার জন্য তিনি বিশ্বের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নৃপতি হিসেবে অমর হয়ে আছেন। এ অধ্যায়ে আমরা সম্রাট অশোক সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- * সম্রাট অশোকের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব।
- * বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে সম্রাট অশোকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারব।
- * সম্রাট অশোকের আদর্শ ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

সম্রাট অশোক

অশোক ভারতের মৌর্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা বিন্দুসার ছিলেন তাঁর পিতা। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন তাঁর পিতামহ। তাঁর মাতার নাম নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অশোকাবদান গ্রন্থ মতে, তাঁর মাতার নাম সুভদ্রজী। দিব্যাবদান গ্রন্থ মতে জনপদকল্যাণী। অশোক নামকরণের একটি সুন্দর কাহিনি প্রচলিত আছে। কথিত আছে, ষড়যন্ত্র করে অশোকের মাতাকে পিতা বিন্দুসারের কাছ হতে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। ফলে তাঁদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এতে অশোকের মাতা খুবই কষ্ট ভোগ করেন। তাঁদের মধ্যে পুনরায় সুসম্পর্ক স্ফূর্তি হয় এবং রানি এক পুত্রসন্তান জন্মান করেন। খুশি হয়ে তখন তিনি বলেন, এখন আমি শোকহীন, এজন্য পুত্রের নাম রাখা হয় অশোক। অশোকের অনেক সৎ ভাই ছিল।

অশোক ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান এবং সাহসী। কথিত আছে, তিনি একটি বাঘকে কাঠের আঘাতে হত্যা করেছিলেন। ছোটবেলায় তাঁকে যুদ্ধবিদ্যা শেখানো হয়। অল্লদিনের মধ্যে তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শীতা অর্জন করেন। দুঃসাহসী কাজ করতে তিনি খুবই পছন্দ করতেন। তিনি ভয়ংকর এবং নির্দয় যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

তাই তাঁকে অবঙ্গিতে দাঙ্গা নিরসনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। রাজা অমাত্যদের বিদ্রোহ দমনের জন্য উজ্জয়িনীতে তাঁকে শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োজিত করা হয়। তিনি সেখানে শৈর্য বীর্ঘের পরিচয় দিয়ে বিদ্রোহ দমন করেন।

পিতা বিদুসারের মৃত্যুর পর সন্তাট অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। কথিত আছে যে, তিনি সিংহাসনে আরোহণের জন্য ১৯ জন ভ্রাতাকে হত্যা করেন। প্রথম দিকে সন্তাট অশোক বদমেজাজি এবং নিছুর প্রকৃতির রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাদের খুব নির্যাতন করতেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পর থেকে তিনি রাজ্য বিস্তারের নেশায় মন্ত থাকতেন। তিনি বিভীষিকাময় এক যুদ্ধে কলিঙ্গ জয় করেন। কলিঙ্গ ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যে অবস্থিত। কথিত আছে, কলিঙ্গ যুদ্ধে দেড়লক্ষ লোককে বন্দী করা হয়েছিল। এক লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়েছিল এবং অসংখ্য লোক আহত হয়েছিল। এরূপ নিছুর প্রকৃতির স্বত্বাবের জন্য তিনি ‘চক্ষাশোক’ নামে পরিচিত ছিলেন। তখন তিনি তৌরিক সন্ন্যাসীদের ভন্ত ছিলেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

‘অশোক’ নাম কেন রাখা হয়েছিল?

সন্তাট অশোক কীভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন?

সন্তাট অশোকের স্বত্বাব কেমন ছিল বর্ণনা কর।

পাঠ : ২

কলিঙ্গ বিজয় ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ

কলিঙ্গ যুদ্ধে জয়ী হলেও সন্তাট অশোক সুখী হলেন না। রাজ্য জয়ের বিনিময়ে দেখলেন রক্তপাত এবং মৃত্যুর বিভীষিকা। কলিঙ্গ যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ দেখে তিনি দারুণভাবে মর্মাহত হন। অনুত্তাপ আর অনুশোচনায় ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন : আমি কী করেছি? এটি জয় নাকি পরাজয়? একি ন্যায় নাকি অন্যায়? একি বীরত্ব নাকি চরম পরাজয়? নিরপরাধ শিশু এবং নারীদের হত্যা করা কি বীরের কাজ? অন্য রাজ্য ধ্বংস করে কি নিজ রাজ্যের সমৃদ্ধি করা যায়? কেউ স্বামী, কেউ পিতা, কেউ সন্তান হারিয়ে হাহাকার করছে -এসব মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞ কি জয় নাকি পরাজয়? একদিন তিনি রাজপ্রাসাদের সিংহঘরে দাঁড়িয়ে এরূপ চিন্তা করছিলেন এবং পাটলিপুত্রের শোভা দেখছিলেন। মনে ছিল অশান্তি ও ভাবাবেগ। এমন সময় সৌম্য, শান্ত ও সংযত সাত বছরের এক শ্রমণ ধীর গতিতে রাজ অঞ্জন দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখামাত্রই সন্তাট অশোকের মনে শ্রদ্ধা জেগে উঠে। তাঁর নাম নিষ্ঠোধ শ্রমণ। তিনি ছিলেন বিদুসারের প্রথম পুত্র যুবরাজ সুমনের সন্তান। অর্থাৎ সন্তাট অশোকের ভ্রাতুষ্পুত্র। সন্তাট অশোক নিষ্ঠোধ শ্রমণকে ডেকে আনবার জন্য এক অমাত্যকে পাঠালেন। শ্রমণ ভিক্ষা পাত্র নিয়ে ধীর গতিতে প্রাসাদে এলেন এবং নিজেকে বুদ্ধের অনুসারী হিসেবে পরিচয় দিলেন। সন্তাট অশোক তাঁর মুখে বুদ্ধের অমৃতময় ধর্মবাণী শুনতে চাইলেন।

নিষ্ঠোধ শ্রমণ ধ্যাপদ গ্রন্থের ‘অপ্রমাদ বর্ণের’ একটি গাথা সন্তাট অশোককে ব্যাখ্যা করে শোনান। গাথাটির মর্মকথা হলো : ‘অপ্রমাদ অমৃত লাভের পথ, আর প্রমাদ মৃত্যুর পথ। অপ্রমত্ব ব্যক্তিরা অমরত্ব লাভ করেন, কিন্তু যারা প্রমত্ব তারা বেঁচে থেকেও মৃতবৎ। এই সত্য বিশেষরূপে জেনে যারা অপ্রমত্ব হয়ে আর্যদের পথ অনুসরণ করেন, সেই ধ্যাননিষ্ঠ, সতত উদ্যোগী, দৃঢ়পরাক্রমশীল, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরম শান্তিরূপ নির্বাণ

লাভ করেন।’ বুদ্ধের এই ধর্মবাণী শোনা মাত্রই সম্রাট অশোকের হনুয় প্রশান্তিতে ভরে উঠল। এ গাথার মাধ্যমে তিনি বুদ্ধের ধর্মের মর্মবাণী উপলব্ধি করেন। অতঃপর তিনি নিষ্ঠোধ শ্রমণের কাছেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। পরিণত হন বৌদ্ধ উপাসকে। সেদিন থেকেই তাঁর রাজ্য জয়ের পরিবর্তে মানুষের অন্তর জয় করার বাসনা হয়। দিঘিজয়ের প্রবল তৃষ্ণা মন থেকে মুছে ফেলেন। রাজ্য জয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়কে তিনি সাধনা হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রজাদের কল্যাণে সর্বদা নিবেদিত থাকতেন। সকলের প্রতি দয়াশীল আচরণ করতেন। সর্বপ্রাণির প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম মমত্ববোধ। তিনি অহিংসা, সত্য, ন্যায়পরায়ণতা, দান, সেবা প্রভৃতি আদর্শকে রাষ্ট্রনীতিতে গ্রহণ করে রাজ্য শাসন করতেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর তিনি ‘চক্ষাশোক’ থেকে ‘ধর্মাশোকে’ পরিণত হন। তিনি ‘দেবনাম প্রিয়দর্শী’ উপাধি লাভ করেন। দেবতাদের প্রিয় ছিলেন এবং সকলকে স্নেহ-মমতার দৃষ্টিতে দেখতেন বলে তিনি এবৃপ্ত উপাধি লাভ করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

সম্রাট অশোক কার নিকট এবং কেন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?

চক্ষাশোক কে ছিলেন? তাঁকে কেন চক্ষাশোক বলা হতো এবং তিনি কীভাবে চক্ষাশোক থেকে ধর্মাশোকে পরিণত হলেন।

পাঠ : ৩

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার-প্রসারে সম্রাট অশোকের অবদান

বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে সম্রাট অশোকের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। ধর্ম প্রচারক হিসেবে তাঁর খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি মৌর্য সম্রাটগণের চিরাচরিত প্রমোদ ভ্রমণ বৰ্ধ করে দেন। তার পরিবর্তে সর্বপ্রাণীর কল্যাণ কামনায় তিনি বুদ্ধের বাণী প্রচার ও তীর্থ ভ্রমণের জন্য ধর্মব্যাত্রার ব্যবস্থা করেন। ধর্ম প্রচারের জন্য ‘ধর্মমহামাত্র’ নামে এক বিশেষ শ্রেণির রাজকর্মচারি নিযুক্ত করেন। তাঁরা নগরে প্রান্তরে সর্বত্র ধর্মনীতি প্রচার করতেন। তিনি প্রজাদের ধর্মশিক্ষার জন্য স্থানে, পর্বতগাত্রে, প্রস্তর স্তম্ভে ধর্মবাণীসমূহ খোদিত করান। নিজেও বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো দর্শনে যেতেন। কথিত আছে, সম্রাট অশোক বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ স্মরণীয় করে রাখার জন্য চুরাশি হাজার বিহার, চৈত্য, স্তূপ ও স্তম্ভ নির্মাণ করান। বিহারের জন্য ভূমি দান করেন।

সম্রাট অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা এবং ভিক্ষু ভ্রমণের লাভ-সংরক্ষণ করে দেয়। তখন অন্যান্য সম্প্রদায়ের তীর্থিক সন্ন্যাসীগণ ভিক্ষুর ছদ্মবেশ ধারণ করে সংঘে প্রবেশ করে সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে থাকেন। তাঁরা বৌদ্ধ বিনয় বিধান মানতেন না। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন না। সর্বদা ভোগবিলাসে মন্তব্য করতেন। নিজেদের মতবাদ বুদ্ধবাণী হিসেবে প্রচার করতেন। তাঁদের দাপটে ধর্মপ্রাণ ভিক্ষুগণ কোণ্ঠাসা হয়ে পড়েন। ফলে সংঘে অরাজকতা দেখা দেয়। বিশ্বজ্ঞলা স্ফুর্ত হয়। ধর্মপ্রাণ ভিক্ষুগণ অবিনয়ী ছদ্মবেশধারী ভিক্ষুদের সঙ্গে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে অস্বীকৃতি জাপন করেন। এ কারণে পাটলীপুর্ত্রে দীর্ঘদিন উপোসথ করে ছিল। সম্রাট অশোক এ খবর শুনে খুবই অসন্তুষ্ট হন। তিনি ভিক্ষুদের উপোসথ পালন করানোর জন্য অমাত্যকে নির্দেশ দেন। বিনয়ী ভিক্ষুগণ অবিনয়ী ভিক্ষুদের সঙ্গে উপোসথ পালন করতে অস্বীকৃতি জানালে অমাত্য বহু বিনয়ী ভিক্ষুর প্রাণসংহার করেন।

এ খবর শুনে সন্তাট অশোক খুবই মর্মাহত হন। মূর্খ অমাত্যের হত্যাজনিত পাপের জন্য তিনি ভিক্ষুসংঘের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি মোগগলীপুত্র তিষ্য খের'র নিকট প্রকৃত বুদ্ধ মতবাদ জ্ঞাত হয়ে অবিনয়ী ছদ্মবেশধারী ভিক্ষুদের সংঘ হতে বহিকার করেন। সংঘ পুনরায় বিশুদ্ধ হয়। সংঘে পুনরায় শান্তি ফিরে আসে। তারপর বিনয়ী ভিক্ষুগণ একত্রিত হয়ে উপোসথ পালন করেন। অতঃপর পুনরায় বুদ্ধের ধর্মবাণী সংগ্রহের জন্য পাটলীপুরের অশোকারামে তৃতীয় সজ্ঞাতির আহবান করেন। এ সজ্ঞাতিতে মোগগলীপুত্র তিষ্য খের'র নেতৃত্বে বুদ্ধবাণী সংগৃহীত হয়। মোগগলীপুত্র তিষ্য খের ভিন্নমতাবলম্বীদের মতবাদ খড়নের নিমিত্তে এই সজ্ঞাতিতে 'কথাবস্থু' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বুদ্ধবাণীর সার প্রতিফলিত হওয়ায় গ্রন্থটি ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তৃতীয় সজ্ঞাতির পর সন্তাট অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য কাশ্মীর, গান্ধার, মহিষমঞ্চ, বনবাস, অপরাহ্ন, মহারাষ্ট্র, যোন, হিমবন্ত প্রদেশ, সুবর্ণভূমি এবং লঙ্কাদ্বীপ বা শ্রীলঙ্কায় ধর্মদূত প্রেরণ করেন। তিনি নিজের পুত্র মহেন্দ্রকে ভিক্ষু এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে ভিক্ষুণী ধর্মে দীক্ষা দান করেন এবং শ্রীলঙ্কায় ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁদের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার-প্রসার লাভ করে। সন্তাট অশোক শ্রীলঙ্কায় পবিত্র মহাবোধির শাখাও প্রেরণ করেন। এভাবে সন্তাট অশোকের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের সীমারেখা অতিক্রম করে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল।



অশোক স্তম্ভ

সন্তাট অশোক নিজে যেমন ধর্মপ্রাণ ছিলেন তেমনি প্রজাদেরও ধর্মপ্রাণ হতে নির্দেশ দিতেন। তিনি প্রজাদের ধর্মবোধ জাগ্রত করতে সমস্ত রাজ্যের পর্বত গাত্রে, স্তম্ভে এবং শিলালিপিতে বুদ্ধবাণী লিখে রাখতেন।

ধর্মবাণী প্রচারের মাধ্যমে তিনি মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর অনুশাসনে উল্লেখ আছে : ‘ধর্ম প্রচার অতি শ্রেষ্ঠ কর্ম। দৃঢ়শীলের পক্ষে ধর্মান্বাস ও ধর্মাচরণ অসম্ভব। ধর্মাচরণের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৃদ্ধি কাম্য। এ লক্ষ্য প্রসারিত হোক।’

সন্তাট অশোক ছিলেন আদর্শ নরপতি ও মহৎ প্রাণের মানুষ। তিনি নিজের সুখভোগ ত্যাগ করেছিলেন। প্রজাদের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর ব্রত। অসাধারণ কর্মবীর, শাসনপটু, ধার্মিক ও মানব হিতৈষী নরপতি সন্তাট অশোক ছত্রিশ বছর রাজত্ব করে খ্রিষ্টপূর্ব ২৩২ অন্দে মৃত্যুবরণ করেন। বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক এবং দানবীর হিসেবে তিনি বিশ্বের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

সংঘ কীভাবে বিশুদ্ধ হয়েছিল?

সন্তাট অশোক যেসব রাজ্যে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেছিলেন তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ : ৪

পরধর্মের প্রতি সহনশীলতা

সন্তাট অশোক মহৎ প্রাণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা, দয়াপ্রায়ণতা ও উদারতার কারণে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত পরমত সহিষ্ণু ছিলেন। তিনি শুধু বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন না, অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতিও ছিল তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি। তিনি ব্রাহ্মণ, জৈন ও আজীবকদেরও শ্রদ্ধা এবং পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁদের দান দিতেন। তিনি নৈতিক আচরণের নীতিসমূহকে সকল ধর্মের সার বলে মনে করতেন। এসব নীতিকে তিনি ভারতবর্ষের সর্বজনীন নীতি হিসেবে সকলের পালনীয় মনে করতেন। তাঁর প্রচারিত নীতিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল : পিতা-মাতা ও গুরুজনদের প্রতি অনুগত থাকবে, জীবিত প্রাণীদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে, সত্য কথা বলতে হবে। নৈতিক ধর্ম হিসেবে এগুলো মানুষকে অনুসরণ করতে হবে। সে যুগে বিভিন্ন ধর্মমতের অনুসারীরা নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করতেন। ফলে তাঁদের মধ্যে বিদ্যেষভাব চরম আকার ধারণ করেছিল। সন্তাট অশোক পরমত সহিষ্ণুতার নীতি অনুসরণ করে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মানুসারীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি পরমত সহিষ্ণুতা এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীময় সম্পর্ক সৃষ্টি করে সমগ্র ভারতবর্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে। পরধর্মের সমালোচনা করবে না।

সন্তাট অশোকের কল্যাণে ভারতবর্ষে সেদিন ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে মিলনের যে ধারা সৃষ্টি হয়েছিল তা আজও সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহাবস্থান অঙ্গুল রাখতে উদ্বৃদ্ধ করে।

সন্তাট অশোক বিখ্যাত ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি শাসনতত্ত্বে বৌদ্ধধর্মকে ব্যবহার করে বিশ্বজয় করেছিলেন। তাঁর রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতি সত্যিকার অর্থে মানব কল্যাণে নির্বেদিত ছিল। তিনি কেবল মানুষের কল্যাণ সাধনেই ব্যস্ত ছিলেন না, সকল প্রাণী ও প্রকৃতির কল্যাণের জন্যও গ্রহণ করেছিলেন নানা উদ্যোগ। পরিবেশ সুরক্ষায় এবং ওষুধের প্রয়োজনে তিনি তাঁর রাজ্যের সর্বত্র গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর রাজ্যে প্রয়োজনীয় গাছ না থাকলে তিনি অন্য রাষ্ট্র থেকে এনে

রোপণের ব্যবস্থা করতেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে জনসাধারণের পিপাসা নিবারণের জন্য আট ক্রোশ অন্তর তিনি কৃপ খনন করেছিলেন। সর্বজনীন কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য।

অনুশীলনমূলক কাজ

পরধর্মের প্রতি সন্তান অশোকের মনোভাব কেমন ছিল?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ

১. বিদ্যুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন।
২. রাজ্যজয়ের বিনিময়ে এবং।
৩. সন্তান অশোক শ্রমণের দেখলেন দীক্ষা নেন।
৪. সন্তান অশোক শাসনতত্ত্বে ব্যবহার করে বিশ্বজয় করেছিলেন।

মিলকরণ

বাম	ডান
১. কলিঙ্গাযুদ্ধের বিভীষিকা দেখে তিনি	ধর্মাশোক নামে খ্যাত হন
২. মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন	অনুষ্ঠিত হয়
৩. বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর চতুর্শোক	শাখাও প্রেরণ করেন
৪. পাটলীপুত্রের অশোকারামে তৃতীয় সঙ্গীতি	বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন
৫. সন্তান অশোক শ্রীলঙ্কায় পবিত্র মহাবোধির	চন্দ্রগুণ

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যুবরাজ অশোক কীভাবে শৌর্য বীর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন?
২. ধর্মহামাত্র নামের এক বিশেষ শ্রেণির রাজকর্মচারী কী কাজ করতেন?
৩. সন্তান অশোক কীভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মনুসারীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সন্তাট অশোকের কলিঙ্গ বিজয় ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কাহিনি বর্ণনা কর।
২. বৌদ্ধধর্ম প্রচারে প্রসারে সন্তাট অশোক কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন লেখ।
৩. অন্যান্য ধর্মের প্রতি সন্তাট অশোকের মনোভাব কী ছিল বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সন্তাট অশোকের পিতার নাম কী?

- | | |
|----------------|--------------|
| ক. চন্দ্রগুপ্ত | খ. বিন্দুসার |
| গ. গোপালচন্দ্র | ঘ. বিষিসার |

২. সন্তাট অশোক কত হাজার চৈত্য বা স্তম্ভ নির্মাণ করেন ?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. ৮০,০০০ | খ. ৮১,০০০ |
| গ. ৮২,০০০ | ঘ. ৮৪,০০০ |

৩. নিচোধ শ্রমণ সন্তাট অশোকের কে হন ?

- | | |
|---------------|-------------------|
| ক. আতুল্পুত্র | খ. কনিষ্ঠ্য পুত্র |
| গ. শিষ্য | ঘ. আতা |

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রাজা ধর্মপাল ধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি সকল ধর্মের ও মতের অনুসারীদের নিয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

৪. রাজা ধর্মপালের সাথে নিচের কোন শাসকের মিল পাওয়া যায় ?

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ক. রাজা বিষিসার | খ. সন্তাট কণিষ্ঠক |
| গ. সন্তাট অশোক | ঘ. রাজা মহাকশ্যপ |

৫. উক্ত শাসকের ধর্মীয় মতের সঙ্গে রাজা ধর্মপালের অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পিছনে নিহিত ছিল-

- i. সাম্রাজ্যের সুদৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা
- ii. সকল ধর্মানুসারীর মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা
- iii. প্রচুর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

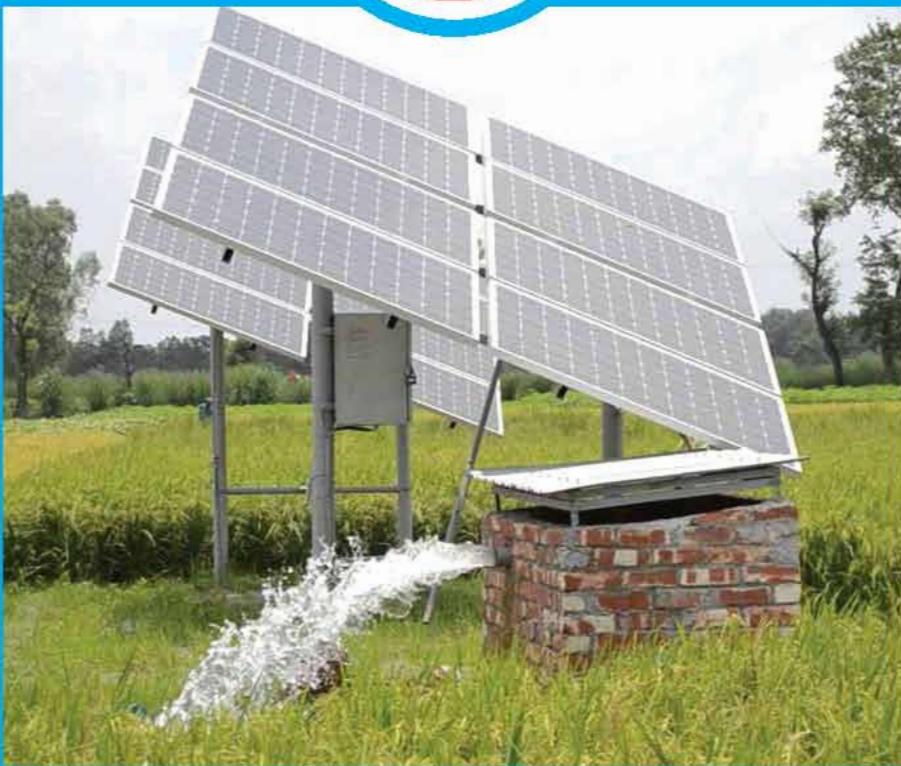
- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. রাজা জনবম এক সাহসী ও নির্দয় শাসক ছিলেন। তিনি নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে এবং নতুন রাজ্য জয় করতে গিয়ে সেখানে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেন। অবসরে তিনি যখন সেই হত্যাকাণ্ডের কথা ভাবতে লাগলেন ঠিক তখনই এক সন্ন্যাসীকে দেখে তার সাথে কথা বললেন। সন্ন্যাসীর কথা শুনে রাজার মধ্যে ধর্মের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হলো। অতঃপর ধর্মীয় বাণী প্রচারের জন্য তিনি রাজ্যের সর্বত্র উক্ত বাণী লিখে প্রজাদের মধ্যে ধর্ম চেতনা উৎপন্ন করলেন। এর পর থেকে রাজা জনবম রাজ্য জয়ের চেয়ে ধর্ম প্রচারের প্রতি বেশি মনোযোগী হলেন এবং মনে করলেন রাজ্য জয়ের চেয়ে ধর্ম প্রচার অতি শ্রেষ্ঠ কর্ম।
- ক. মগধ বর্তমানে ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত ?
 খ. ‘অপ্রাদ অমৃত লাভের পথ আর প্রাদ মৃত্যুর পথ’ ব্যাখ্যা কর।
 গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাজা জনবমের কর্মকাণ্ডে বৌদ্ধধর্মের কোন রাজার সঙ্গে মিল রয়েছে ?
 ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. ‘রাজ্য জয়ের চেয়ে ধর্ম প্রচার অতি শ্রেষ্ঠ কর্ম’-রাজা জনবমের বক্তব্যটির সঙ্গে তুমি কী একমত ? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
২. বিনয় বড়ুয়া নিজ অর্থ ব্যয়ে অনাথ-অসহায়দের ভরণ-পোষণ ও ধর্ম শিক্ষার জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। বিনামূল্যে ও বিনা পরিশ্রমে আহার এবং অন্যান্য সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্য অনেক ভঙ্গ ব্যক্তি পরিচয় গোপন করে আশ্রমে যোগ দিলেন। একপর্যায়ে ভঙ্গ ব্যক্তিরা অনাথ-অসহায়দের ওপর নির্মম নির্বাতন চালাতেন। এতে আশ্রমে চরম বিশ্বালো দেখা দিলে বিনয় বারু প্রকৃত সত্য নির্ণয় করে ভঙ্গদের বের করে দেন। ফলে আশ্রমটি ধৰ্মসের হাত থেকে রক্ষা পেল।
- ক. সন্মাট অশোক কার কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন ?
 খ. সন্মাট অশোক ‘চক্ষাশোক’ থেকে ‘ধর্মাশোকে’ কীভাবে পরিণত হলেন ?
 গ. বিনয় বড়ুয়ার কাজের সাথে সন্মাট অশোকের কোন ঘটনার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে-ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. আশ্রম রক্ষায় বিনয় বড়ুয়ার কাজটি সন্মাট অশোকের কার্যাবলির প্রতিচ্ছবি-উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

শারীনতার
৫০
বছো
উন্নয়ন আমারণ



সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প

প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' এই শ্লেষানকে সামনে নিয়ে প্রচলিত গঞ্জতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি যৈমন, সৌরবিদ্যুৎ, উইভিল ও বায়োগ্যাস থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। সূর্য থেকে বিকিরণ হওয়া তাপশক্তিকে রাসায়নিক বিক্রিনীর মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তাই হলো সৌরবিদ্যুৎ। বাংলাদেশে অফ-গ্রিড এলাকায় (চৰ, হাওড় ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকা) সৌরবিদ্যুৎ মানুষের জীবনধারার মানে পরিবর্তন এনেছে। জাতীয় প্রবৃক্ষি অর্জন, দায়িত্ব বিয়োচন এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। দেশের বিদ্যুৎ খাতে অন্তর্গুর্ব উন্নয়নের ফলে অবকাঠামো, কৃষি ও শিল্প খাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে এবং নতুন কর্মসংজ্ঞান সৃষ্টি হয়েছে। সৌরবিদ্যুৎ পরিবেশ-বাহ্যিক হওয়ায় বেসরকারি পর্যায়ে ভবনের ছাদে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন জনপ্রিয় করার জন্য 'মেটে মিটারিং গাইডলাইন' প্রণয়ন করা এবং বিদ্যুৎবিহীন এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অআধিকার ভিত্তিতে সোমার প্যানেল স্থাপন করা হচ্ছে।



গুণীর সমাদৰ সর্বত্র

- জাতক

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হবে
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টেল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য